নরক স্বর্গ নরক

মায়া বসু

শশধর প্রকাশনী
৩২, পণ্ডিতিয়া টেরেস
বালিগঞ্জ, কলিকাতা—৭০০০১৯

প্রকাশক :
শশধর প্রকাশনী
৩২, পণ্ডিতিয়া টেরেস
বালিগঞ্জ, কলিকাতা - ৭০০০২৯

প্রথম প্রকাশ :
রথযাত্রা, ১৩৭০

প্রিন্টার : অমল বন্দ্যোপাধ্যায়
মৌ প্রেস
১৯এ, কেদার বসু লেন
কলিকাতা-২৫

স্টেশনটা নতুন অখ্যাত এবং ছোট। কিন্তু নির্জন আর সুন্দর। চারদিকে বড় বড় গাছপালা। ঝাকড়া ঝুপসী শাখাপ্রশাখার সবুজ সতেজ শোভাও যেমন আছে, তেমনই আছে নানা রকমের মরশুমি ফুলের গাছ। ফুলবাগানের মতই যেন প্লাটফরমটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হয়েছে। দূরে দিগন্তরেখায় পাহাড়ের ইশারা। কখনো অস্পষ্ট ধূসর। কখনো বা স্পষ্ট কালচে খয়েরী।

প্লাটফরমে খানকতক বেঞ্চিও পাতা হয়েছে সম্প্রতি। তাতে বেশীর ভাগ সময় যাত্রীর চেয়ে খালাসী কুলি পয়েন্টস্‌ম্যানরাই শুয়ে বসে ঘুমিয়ে থাকে। যদিও সংখ্যায় তারা খুব বেশী হবে না।

এই নতুন স্টেশনটায় যখন তখন ট্রেন আসা-যাওয়া করে না। সকাল বিকেল সন্ধ্যে আর ভোর-রাত্তিরে আঙুলে গোণা যায় এমন ক'টা আপ আর ডাউন ট্রেন কিছুক্ষণের জন্যে থমকে দাঁড়ায়। হুইশেল দেয়, ধোঁয়া ছাড়ে। তারপরই দ্রুতগতিতে ধাবমান হয়ে চলে যায়।

মাত্র এই সময়টুকুতেই প্লাটফরমটায় কিছুটা স্পন্দন জাগে। ব্যস্ততা। ছুটোছুটি। অল্প কয়েকটা লোক নামে, তার চেয়েও কম লোক ওঠে। টুকরো টুকরো কথা। দ্রুত পায়ের শব্দ। ঘণ্টাধ্বনি। হুইশেলের তীব্র তীক্ষ্ণ আওয়াজ—দেহাতী দুর্বোধ্য বুলিতে কিছুটা চেঁচামেচি।

তারপরই সব শব্দ থেমে যায়।

এক অখণ্ড নির্লিপ্ততা নীরবতার মধ্যে মগ্ন হয়ে যায় ছোট্ট স্টেশনটা। হঠাৎ জেগে উঠেই, আবার যেন হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ে।

স্টেশনের খুব কাছেই গোটা দুতিন ছোট কোয়ার্টারস্‌। বাঁদিকের দুটো দেখা যায়। ডানদিকের কোয়ার্টারটা গাছপালার আড়ালে প্রায় অদৃশ্যই বলা চলে। দু পাশের কোয়ার্টারস্‌ এর মধ্যে অনেকখানি ব্যবধান। উঁচু নীচু মাটির ঢিবি। আগাছার জঙ্গল। মাঝখানে সরু আঁকাবাঁকা পথ।

সব মিলিয়ে পরিবেশটা বড় নিঃসঙ্গ আর নির্জন বলে মনে হয়। বিশেষ করে ডানদিকের একক কোয়ার্টারকে।

মনে হবার কারণও আছে।

মাত্র দুজন মানুষ ছাড়া এই ছোট্ট গাছপালায় ঢাকা কোয়ার্টারটায় আর কেউ থাকে না।

সেই দুজন মানুষের একজন এই নতুন স্টেশনের স্টেশন-মাস্টার ভবেন ভট্টাচার্য আর তার রূপবতী যুবতী বৌ কল্যাণী।

ছোট ছোট দুটো ঘর। বাইরে, ভেতরে বারান্দা। একটু উঠোন। রান্নাঘর। বাথরুম। সাধারণতঃ স্টেশনের কোয়ার্টারসগুলো যেমন হয়, তেমনই। একপাশে কলাগাছের ঝাড় লাউমাচা গাঁদাফুলের গাছ আর তুলসীমঞ্চ। যেখানে যেখানে যেটি থাকবার কথা, সেখানে সেখানে সবই ঠিকঠাক সাজানো আছে। আরো আছে অজস্র পাখির ওড়াউড়ি কিচির মিচির। বাতাসের শির্ শির্। বারান্দায় দাঁড়ালে চোখে পড়ে দূরে বিস্তারিত কাশকুশশরের পরিপূর্ণ প্রান্তর। সেই দিকে সীমাহীন তৃণভূমির মধ্যে উধাও হয়ে মিলিয়ে যাওয়া দুটি সমান্তরাল রেললাইন।

এই অবারিত আকাশের নীচে এই মুক্ত অনির্বচনীয় প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী সত্যিই শুধু নয়নমনোহর নয়, হৃদয়হরণও বটে।

কিন্তু—বড় নির্জন—বড় নিঃসঙ্গ। মাঝে মাঝে গা ছম্ ছম্ করে ওঠে, এমনই নিস্তব্ধতা।

কল্যাণীদের কোয়ার্টারে মানুষ-জনের সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।

কিন্তু একেবারে পাওয়া যায় না, একথা পুরোপুরি সত্যি নয়। বিশেষ করে যে বাড়ীতে দুজন জীবন্ত সুস্থ মানুষ বাস করে। পুরুষ ও রমণী। যেখানে দুজনের খাওয়া দাওয়া ওঠা-বসা হাট-বাজার ধোপা নাপিত রান্না-বান্না—অর্থাৎ পরিপূর্ণ একটা সংসার আছে।

কল্যাণীর ঝি নেই। বুধন আছে। স্টেশনের দেহাতী কুলি। লম্বা বলে একটু কুঁজো। বয়স হয়েছে, মাথার চুলে পাক ধরেছে। প্রায় সব সময়ই ঠোঁটের জিভের তলায় খইনি টিপে চুপচাপ কাজ করে। কল্যাণীর ইচ্ছে থাকলেও তাই তার সঙ্গে বাক্যালাপের সুযোগ বড় একটা হয় না।

বুধন ইঁদারা থেকে জল তোলে। বাসন মাজে। উঠোন ঝাঁট দেয়। মশলা বাটে। দরকার হলে দোকান থেকে এটা-সেটা এনেও দেয়। কিন্তু তার বেশী আর কোন কাজ নয়। নির্দিষ্ট সময়ের বাঁধা-ধরা কাজটুকু যেমন-তেমন করে শেষ করেই সে নিজের ঘরে অথবা স্টেশনে আড্ডা দিতে ছোটে। কাজ করতে ডিউটি দিতে ছোটে।

চায়ের সঙ্গে খানকতক পরোটা আর বেশ খানিকটা আলুর দম তারিয়ে তারিয়ে খেতে খেতে ভবেন বলল, 'পরোটা নরম হয় নি কেন? ময়েন কম দিয়েছিলে বুঝি?'

কল্যাণী অল্প ঘাড় নাড়ল। 'না তো, রোজ যেমন দি তেমনিই তো দিয়েছি।'

ভবেন মুখখানা ব্যাজার করল, 'শক্ত হয়েছে। আলুর দমের আলু-গুলোও তেমন নরম হয়নি। ঝালও হয়েছে বেশ।'

এবার কল্যাণী জবাব দিল না।

'পেঁয়াজবাটা দাওনি?'

'কুচিয়ে দিয়েছি।'

'একটু বেটে দিলেই পারতে। টেস্ট ভাল হত আরো।'

কল্যাণী নীরব।

'রান্নার হাত তোমার দিন দিন খারাপ হচ্ছে। রাতদিন বাড়ি বসে বসে কর কি? রান্নাটাও যদি ভাল করে না করতে পার তো করবেটা কি? বসে বসে খাবে আর ঘুমোবে?'

কল্যাণীর মুখ শক্ত হয়ে উঠল।

'এক গ্লাস জল দাও।'

কল্যাণী ঘরের কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে এনে ভবেনের সামনে রাখল।

পরোটা আলুর দমের, বৈকালিক জলখাবার তৈরীর নিন্দে করলেও কিন্তু দেখা গেল খানদশেক পরোটা আর একবাটি আলুর দমের সবটাই খেয়েছে ভবেন। শক্ত শক্ত আলু অথবা ময়েন কম দেওয়া পরোটার এককুচিও পাতে ফেলে রাখেনি।

চায়ের কাপটা মুখে তুলে সে আবার মুখ বাঁকালো। 'এঃ, চা টা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আর এক কাপ দাও। বেশ গরম গরম দেবে। জানই তো আমি ঠাণ্ডা চা খেতে পারি না।'

এক চুমুকে চা-টা নিঃশেষ করে ভবেন শূন্য কাপটা এগিয়ে দিল কল্যাণীর দিকে।

কল্যাণী এবার কোন কথা বলল না। চায়ের কেটলিটা হাতে নিয়ে রান্নাঘরে জ্বলন্ত স্টোভটায় বসিয়ে চা-টা গরম করে কাপে ঢেলে ভবেনের হাতে তুলে দিল।

'টাটকা চায়ের স্বাদই আলাদা। করে রাখা চা বার বার গরম করলে টেস্ট থাকে না।' গম্ভীর মুখে কথাটা বলে ধীরে-সুস্থে দ্বিতীয় কাপটাও শেষ করল ভবেন। তারপর বাথরুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে বারান্দায় উঠে এসে হাত বাড়াল, 'গামছাটা কই ?'

সামনেই গামছাটা ঝুলছিল, কল্যাণী এগিয়ে গিয়ে সেটা ওর হাতে দিল।

'খাবার জল ?'

'ঘরের টেবিলের ওপর আছে।'

'পানের কৌটো কোথায় ? অ্যাঁ ? পানের কৌটো ? কই গো, এসো না, কোথায় রেখেছ, দাও। ট্রেন আসবার সময় হয়ে গেছে। পাস্ করিয়ে আসি। কে জানে দেবেনবাবু স্টেশনে আছে কিনা।'

কল্যাণী ভবেনের হাতে সেজে রাখা পানের কৌটোটা ধরিয়ে দিল।

গোটা দুই পান মুখে পুরে, চিবোতে চিবোতে বাইরের দরজা দিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে ভবেন আবার চেঁচালো, 'দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যাও। তাড়াতাড়ি এসো।'

'যাচ্ছি। তুমি যাও না—'

ভবেন তবু দাঁড়িয়ে রইল। অসহিষ্ণু গলায় গজ গজ করতে লাগল, 'আঃ, বলছি না, দরজাটা আগে বন্ধ করে দিয়ে যাও! দেরী হয়ে যাচ্ছে আমার এদিকে।'

ভেতর থেকে কল্যাণীর শক্তগলার জবাব ভেসে এল—'বলছি না কাপ-ডিশগুলো সরিয়ে রেখে না গেলে এখুনি কাকগুলো ঠুকরে ঠুকরে ফেলে ভাঙবে। তুমি যাও না, আমি যাচ্ছি ওগুলো সরিয়ে রেখে।'

'ভাঙবে ভাঙবে আমার পয়সা নষ্ট হবে।' বাইরে থেকে ভবেন খেঁকিয়ে উঠল। 'দয়া করে আগে দরজাটা বন্ধ করে, তারপর হাত পা কোলে করে চেয়ারে বসে কাক তাড়াওগে যাও।'

কল্যাণী কাপ-ডিশগুলো সরিয়ে রেখে বাইরের দিকের দরজাটা বন্ধ করে দিল। ভবেনের জুতোর শব্দ সিঁড়ির শেষ ধাপ থেকে ক্রমশ স্টেশনের পথের দিকে মিলিয়ে গেল।

কল্যাণী আবার এঘরে ফিরে এল।

এখানে ওখানে ছাড়া ধুতি শার্ট লুঙ্গি বিছানার চাদরটা এলোমেলো। বাড়িতে পরবার চটিজুতো দুটোর একপাটি ঘরে, অন্যটা বারান্দায়। ভবেন যেমন অগোছালো, তেমনই নোংরা স্বভাবের মানুষ।

অথচ প্রত্যেকটি জিনিসই ওর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই। হাতের কাছে থাকা চাই। না হলেই মেজাজ গরম। পান থেকে চুন খসলেই চেঁচামেচি। রান্নার ব্যাপারেও তাই। ভীষণ খুঁতখুতে। এতটুকু এদিক-ওদিক হলেই কল্যাণীকে কথা শুনতে হয়, খোঁটা শুনতে হয়। ওর চিন্তার প্রায় সবটাই খাদ্য-বিষয়ক।

কল্যাণী বিছানা পরিষ্কার করে ঘরদোর গোছালো। ভবেনের ছাড়া জামা কাপড় জুতো যথাস্থানে গুছিয়ে রাখল। ঘর বারান্দা ঝাঁট দিল। আরো অনেক খুঁটিনাটি কাজ শেষ করল।

তারপর হাত মুখ ধুয়ে চুলটা বাঁধবে কি বাঁধবে না ভাবতে ভাবতে খোলা জানলাটার ধারে এসে দাঁড়াল।

এখন শীত ঋতুর ছোট বেলা। বিকেলের নিস্তেজ ম্লান রোদটুকু অতি দ্রুত মিলিয়ে আসছে। আকাশের বুকে কোথাও হালকা মেঘ, কোথাও ধূসর শূন্যতা। হাওয়ায় লেবুপাতার গন্ধ। ঘাসে ঘাসে ঝোপে-জঙ্গলে প্রজাপতি উড়ছিল। কাঠবেড়ালিগুলো লুকোচুরি খেলছিল। লম্বা লম্বা গাছগুলোর অনেক ওপর দিয়ে বুনো হাঁসগুলো হালকা পাথায় উড়ে যাচ্ছিল, দিগন্তরেখার দিকে।

সেই দিকে তাকিয়ে কল্যাণী সহসা উন্মন হয়ে গেল। অনেক দিনের পুরনো কোন বিষাদের, নাকি সুখের, দুঃখের—আনন্দ-বেদনার স্মৃতি ওর সমস্ত হৃদয়কে আলোড়িত করে তুলল।

মনে পড়ে গেল, তার গত জীবনের কথা।

গত জীবন? না গত জন্ম? কে জানে?

কমলাপুরের মত এমন জংলা নির্জন নিরিবিলি জায়গা নয়। জনারণ্য কলকাতা। সহর কলকাতা।

দুঃস্বপ্নের মিছিল ধর্মঘট, পথেঘাটে ট্রামেবাসে উপচে পড়া ভিড় নিয়ে, পাশাপাশি চরমতম দারিদ্র্য আর চূড়ান্ত ঐশ্বর্য্য নিয়ে, প্রাসাদের পর প্রাসাদ, আর মাল্টিস্টোরীড বিল্ডিং-এর পাশে সঙ্কীর্ণ অলিগলি আর নোংরা

খুপরী ঝুপড়ী বস্তি নিয়ে, ফ্রী স্কুল স্ট্রীট, সোনাগাছি, হাড়কাটা, ছিদাম মুদীর লেন, চিৎপুর কালীঘাট আর চৌরঙ্গী, পার্ক সার্কাস, থিয়েটার রোড ক্যামাক স্ট্রীট্, লিণ্ডসে স্ট্রীট নিয়ে, উজ্জ্বল আলো, নিকষ কাল অন্ধকার পাপপুণ্য ভালমন্দ সব কিছু নিয়ে, এক বিচিত্র চরিত্র আর দুর্বোধ্য হৃদয় নিয়ে সেই জোব চার্ণকের আমল থেকে, অটল অচল হয়ে বসে আছে।

সেখানে সিনেমা-থিয়েটার, মাঠঘাট, গঙ্গার ধার, ইডেন, ভিক্টোরিয়া, ময়দানে কত আলো হাওয়া, কত আনন্দের উপকরণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

সেখানে কত বিচিত্র চরিত্রের মানুষ—

বিচিত্র চরিত্র।

মাত্র কয়েকটা বছর আগেকার দেখা একটি মানুষের স্মৃতি উত্তরঙ্গ ঢেউ হয়ে কল্যাণীর বুকের ভেতর আছড়ে পড়ল।

মণিমোহন! মণিমোহন রায়।

একজন উচ্চশিক্ষিত সুদর্শন মার্জিত মনের মানুষ।

ভবেন ভট্টাচার্যের বিবাহিতা স্ত্রী কল্যাণীর······ না না—না। কল্যাণীর নয়। জবা বলে একটি খারাপ মেয়ের মনের মধ্যে আজও যিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন।

তাকে কল্যাণীও চিনতো—

ভাল করেই চিনতো। তাই এতদিন বাদেও তাকে ভুলতে পারেনি।

সেই পণ্ডিত মানুষটি বেশ কিছুকাল ধরে তার সঙ্গ সান্নিধ্য পাণ্ডিত্য, তার রুচি প্রবৃত্তি আর কথা দিয়ে জবার মনটাকে পরিশীলিত উন্নত করে তুলেছিলেন।

তাঁর কথার যাদুতে জবা নিজেকেই ভুলে গিয়েছিল। খাঁচার পাখি বাধাবন্ধহীন আদিগন্ত আকাশে ওড়ার স্বপ্ন দেখেছিল।

মণিমোহন রায় একটা মফঃস্বল কলেজের প্রফেসর ছিলেন। স্বভাবে ধীর স্থির, কিছুটা লাজুক প্রকৃতির মানুষও বটে। কিন্তু জবাকে কাছে পেলে কত কথাই না বলতেন। কত গল্প কত আশা ভরসা আকাঙ্ক্ষার কথা।

জবার কাছে যারা আসতো মণিমোহন রায় তাদের সকলের চেয়ে অনেক—অনেক উঁচু দরের লোক ছিলেন। তাঁর লোভ মোহ মুগ্ধতা থাকলেও, বিকৃত লালসা ছিল না। কামের আবেগ থাকলেও, সংযম শাসন তাঁর আয়ত্তে ছিল।

যে জন্যে, কল্যাণীর মনের মধ্যে যে জবার অস্তিত্ব এখনো বেঁচে আছে, তার মনের মধ্যেও মণিমোহন রায় এখন পর্যন্ত জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হয়ে বেঁচে আছেন।

কত কথাই না বলতেন! কত কবিতা কত গল্প। জবা বলে সেই অল্প লেখাপড়া জানা মেয়েটা যার অর্থ প্রায় কিছুই বুঝতনা।

শুধু বিস্ময় জড়ানো, শ্রদ্ধামেশানো কাজলটানা অবাক চোখে সেই বিচিত্র পুরুষটির বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতো।

মণিমোহন রায় আবেগজড়িত কণ্ঠস্বরে জবাকে আবৃত্তি করে শোনাতেন:

'খুদ আপনে হালকা য়্যাহসাশ্
নেহি হ্যায় মুঝকো
আওরোঁ সে শুনা হুঁ কি পরেশাঁ হুঁ ম্যায়।'

একবার নয়। দুবার তিনবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লাইনকটি বলার পর জিজ্ঞাসা করতেন, 'এর অর্থ বুঝতে পারছো?'

বারবার লাইনকটি শোনার ফলে জবার মনে সেটা দাগ কেটে যেত। (ভগবানকে ধন্যবাদ ভাগ্যিস ওর লাইনের অন্য মেয়েদের মত ও একেবারে অশিক্ষিত অথবা মূর্খ ছিল না। বেশ খানিকটা লেখাপড়া শেখার সুযোগও পেয়েছিল) মুখস্থ হয়েও যেত।

মণিমোহনের প্রশ্নের উত্তরে ভ্রূকুটি করে বলতো—'না। আমি কি আপনার মত বিদ্বান?'

'ভুল জবা ভুল। বিদ্বানরাও অনেক কিছু জানেনা, যা তোমার মত মেয়ে জানে।'

'কী যে বলেন, তার ঠিক নেই।'

'আমি ঠিক কথাই বলছি জবা। সত্যি বলছি।'

'আপনি আমাকে ওই কবিতার বাংলা অর্থ বলে দিন।'

'ওটা কবিতা নয়। উর্দু সায়ের।' শোন বলছি—

'আমার নিজের অবস্থা আমি নিজে অনুভব করতে পারি না। অন্য লোকে বলে, আমি নাকি তোমাকে ভালবেসে অশান্ত অস্থির পাগল হয়ে গেছি।'

জবার আন্তরিক ভালবাসা, মুগ্ধতা, তার চোখের দৃষ্টিতে মুখের অভিব্যক্তিতে ফুটে উঠতো। নরম গলায় বলতো, 'খুব সুন্দর সায়ের বলেন তো আপনি।'

'তোমার ভাল লেগেছে জবা?'

'হ্যাঁ, খুব ভাল লেগেছে।'

'আর একটা শুনবে? আরো সুন্দর?'

'বলুন। আপনি ছাড়া আর কেউ তো আমাকে এসব শোনায় না। দুবার তিনবার করে বলতে হবে কিন্তু। আমি মুখস্থ করে রাখবো।'

'মনে থাকবে? মনে রাখতে পারবে?'

'পারবো বলেই তো মনে হচ্ছে।'

'খুব ভাল। মাঝে মাঝে যখন প্রেম ভালবাসার ব্যাপারে খুব দুঃখ পাবে, তখন একলা ঘরে বসে আবৃত্তি করে নিজেকেই শুনিও। দেখবে, অনেক দুঃখ-কষ্ট যন্ত্রণার লাঘব হয়েছে।'

'শবে ফুর্কত মে ইয়াদ উস্ বেখবর
বার বার আয়ি
ভুলানা হামনে ভি চাহা
মগর বেইখতিয়ার আয়ি।'

'বিচ্ছেদের রাত্রে বার বার প্রিয়ার কথাই মনে পড়ে। মনে পড়ে শুধু তারই স্মৃতি। ভোলবার চেষ্টা করলেও কোনমতে ভোলা যায় না। মনের মণিকোঠায় বার বার সেই মুখখানাই উঁকি দেয়।'

সেই মণিমোহন রায় এখন কোথায়? কত দূরে? জবা তো তাকে মনে রেখেছে। তার সায়ের মুখস্থ করে রেখেছে।

কিন্তু সেই প্রবঞ্চক প্রতারক পুরুষটির কি কখনো মনে পড়ে জবার কথা? জবাকে কথা দিয়ে যে কথা রাখেনি, তার সেই মিথ্যাচারিতার কথা?

না, মনে পড়ে না।

জবা জানে, পুরুষেরা ভুলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই থাকে।

বিশেষ করে জবার মত মেয়েদের মনে রাখবার মত মন বা হৃদয় তাদের থাকে না।

একটা বুক ভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস কল্যাণীর অভ্যন্তর থেকে নির্গত হয়ে, উত্তরের বাতাসে মিশে গেল।

তন্ময়তা ভাঙল গাছপালার আড়ালের সিগন্যাল পোস্টটার দিকে তাকিয়ে। পুরো পোস্টটা দেখা না গেলেও জানালা দিয়ে স্টেশনের বেশ খানিকটা নজড়ে পড়ে।

গাড়ি আসবার সময় হয়েছে।

কল্যাণী দরজা খুলে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। ভাগ্যিস এই ছোট্ট রেল কোয়ার্টারের ছোট্ট বারান্দাটুকু ছিল! নইলে কল্যাণীর সময় কাটত কেমন করে? খাঁচায় বন্দী পাখির মত ওই পার্টিশন করা খুপরি দুটোর মধ্যেই একা একা রাত-দিন পাখা ঝাপটে মরতে হত।

স্টেশনটা খুব কাছে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে ওই গাছপালাগুলোর মধ্যেকার সরু পথটা দিয়ে জোরপায়ে গেলে বোধহয় চার-পাঁচ মিনিটও লাগবে না। সেখানে তবু কয়েকটা মানুষজন আছে। কথাবার্তা চেঁচামেচি আছে। ট্রেনটাকে খুব কাছে থেকে দেখা যায়। জানলায় বসে থাকা মানুষগুলোকে ভাল করে নজর করা যায়। এক একদিন কল্যাণীর ভারী ইচ্ছে হয়, একছুটে ওই প্লাটফরমে গিয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু—কিন্তু উপায় নেই —কোন উপায় নেই—

মাত্র বদলি হয়ে অন্য স্টেশনে চলে যাবার দিন ছাড়া, আর কোনদিন কোনক্রমেই কল্যাণী স্টেশনে দাঁড়াতে পারবে না। সমস্ত জীবন ধরে মাথায় একগলা ঘোমটা টেনে, তারই ফাঁক দিয়ে রেল কোয়ার্টারের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কল্যাণী ট্রেন আসা-যাওয়া দেখবে।

হুইশেল বাজবে, ঘণ্টা বাজবে।

সিগন্যাল পোস্টের মাথায় জ্বলে থাকা লাল আলো নীল হবে, নীল আলো লাল হবে।

যাত্রীরা উঠবে, নামবে।

সেই অপসৃয়মান প্রবাহ দূর থেকে অনুভব করবে।

একদিন নয় দুদিন নয়, যতদিন কল্যাণী বেঁচে থাকবে, ততদিন।

কল্যাণীকে আড়াল করে, অন্ধকার করে, তারই সামনে দাঁড়িয়ে থাকা

গাছগাছালিগুলোর শাখাপ্রশাখাগুলো উত্তুরে বাতাসের দাপটে শির্ শির্ শর্ শর্ শব্দ করছিল। ডালপালাগুলো এদিকে ওদিকে, এপাশে ওপাশে এমনভাবে আন্দোলিত হচ্ছিল যে, সেদিকে তাকিয়ে কল্যাণীর মনে হল, আমূলবিদ্ধ ও বৃক্ষগুলোও যেন নড়ে চড়ে কোথাও চলে যেতে চায়। একঘেয়ে জীবনের পরিবর্তন চায়।

যে সুকঠিন অদৃশ্য শিকলে কল্যাণী এখানে বাঁধা আছে, ওই গাছগুলোও ঠিক তেমনই একই জায়গায় একই মাটিতে শেকড় গেড়ে চরম পরিণতির জন্য স্থির হয়ে প্রতীক্ষা করছে।

ওরাও কোনদিন কোথায় যেতে পারবে না।

নড়বেনা সরবেনা।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একদিন জীর্ণ শীর্ণ হয়ে, সব শোভা সৌন্দর্য সজীবতা হারিয়ে কয়েক টুকরো শুকনো কাঠে পর্যবসিত হবে।

আচ্ছা গাছেরও তো প্রাণ আছে ?

এই মুহূর্তে কল্যাণী যেমন ভাবে নিজের অবস্থা অনুভব করতে পারছে, ওই গাছগুলোও কি তেমনই এক জায়গায় থেমে থাকার যন্ত্রণাটা উপলব্ধি করতে পারছে ?

এই চিন্তা মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণীর মনে হল, ও নিজেও যেন একটা গাছ হয়ে গেছে।

এই ছোট্ট খুপরী ঘরটার মধ্যে, নাকি একটা সেলের মধ্যে ফাঁসীর আসামীর মত বন্দী হয়ে আছে।

আগে ও ছিল একটা অতি সুন্দর সতেজ সবুজ শ্যাওলার মত ভাসমান লতা। যে লতা বহমান জীবনের স্রোতের টানে এঘাটে ওঘাটে ভেসে ভেসে নিত্য নতুন রসের আস্বাদ নিত।

কিন্তু এখন কল্যাণী একটা নিস্প্রাণ নীরস পত্রপল্লবহীন শীর্ণ বৃক্ষ হয়ে গেছে। কমলাপুর বলে অতি অখ্যাত অবহেলিত একটা স্টেশনের ছোট্ট কোয়ার্টারের ততোধিক ছোট্ট খুপরীর মধ্যে শেকড় ছড়িয়ে, দিনের পর দিন একই জায়গায় অনড় অচল হয়ে বসে আছে।

ওর বন্ধু নেই বান্ধব নেই। সঙ্গী সাথীও নেই।

অন্য কোন সংসারে মিশে যাবার মত, লোকালয়ে সমাজে মাথা উঁচু

করে চলবার মত ক্ষমতাও নেই। বাইরের কোন আনন্দ উৎসবে যাবার অধিকারও ওর নেই।

একমাত্র অতি অপদার্থ স্বামী ভবেনের পদসেবা করা ছাড়া ওর অন্য কোন কাজও নেই।

যতদিন যাচ্ছে, কল্যাণী ক্রমশ বুঝতে পারছে, এখানে, এই গাছটার শাখাপ্রশাখা ছড়ানোর জন্যে কোন আকাশ নেই। মাটির তলায় সরস উপাদান নেই। রোদ্দুর নেই।

যতদিন যাবে, বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা ওই স্তব্ধ নিঃশব্দ গাছগুলোর মত ওর পাতা পল্লবগুলোও শুকনো শীর্ণ হলুদ হয়ে যাবে। তারপর একদিন হাওয়ায় উড়ে উড়ে ঝরাপাতা হয়ে মাটির ধুলোর ধুলো হয়ে মিশে যাবে।

নতুন করে কোন বসন্ত ওর সর্বাঙ্গ পল্লবিত কুসুমিত করে দেবেনা। উড়ে যেতে যেতে ক্লান্ত দূরযানী পাখিরা ওর ডালে বসে বিশ্রাম নেবেনা। গানও গাইবে না।

এই ওর নিয়তি।

এই ওর ভাগ্য।

আর—আর সবচেয়ে বড় কথা, এই নিদারুণ বন্দীদশা, এই একাকীত্ব, ওর নিজেরই সৃষ্টি।

লোভে পাপ। পাপে মৃত্যু।

এই চিরন্তন সত্য প্রবাদ বাক্যটি কি কল্যাণীর জানা ছিল না? ছিল বই কি।

কিন্তু জবা বলে যে মেয়েটি একদিন স্বেচ্ছায় কল্যাণীতে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল, সে জানতো, এমন একটা কিছু বহুমূল্য বস্তুর জন্যে সে লোভ করেনি।

বামন হয়ে চাঁদের দিকে সে হাত বাড়ায় নি। বরং, সেটা তার তথাকথিত স্বামী ভবেন ভট্টাচার্যই করেছিল। জবা চাঁদেরের গলার মুক্তোর হারের মতই তার গলায় নিজেকে দুলিয়ে দিয়েছিল।

চাঁদ তো দূরের কথা—

কল্যাণী যা পেয়েছে, তা একেবারে গলিত ধাতুর নাকি কাদামাটির একটা অক্ষম অপদার্থ মনুষ্য সংস্করণ।

সাত ভাই চম্পা জাগরে—

না না। সাত ভাই নয়। একটি বোন পারুলও নয়।

সাতটি দুঃখী মেয়ে সাত রাজ্য থেকে, যন্ত্রণার সমুদ্রে ভেসে ভেসে একটি দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছিল।

সেই সাতটি মেয়ের নাম ছিল যূথি, চামেলী, পারুল, হেনা, টগর, মল্লিকা আর জবা।

একটি তোড়ায় গাথা সাতটি ফুল।

তাদের মধ্যে কী ভালবাসা, কী বন্ধুত্বই না ছিল? একই সঙ্গে ওঠা-বসা, খাওয়া-শোওয়া, সুখ-দুঃখের, মনের প্রাণের কথা বলাবলি। কেউ কারু কাছে কোন কথা লুকোতনা। যত গোপন, যত খারাপ কথাই হোক সবাই সবার কথা সকলের কাছে খুলে বলতো।

সেই সুন্দর সাতটি ফুলে সাজানো তোড়া থেকে জবা নামের ফুলটি স্বেচ্ছায় বৃন্তচ্যুত হয়ে নতুন নামে নতুন শাখায় ফুটে থাকবে বলে সেখান থেকে চলে এসেছিল।

কিন্তু হলনা—হলনা।

জবার প্রেতাত্মা তা হতে দিল না।

জবা আকাশ ছোঁয়া এক বিরাট পর্বতের মত তার ঘন কাল ছায়া দিয়ে, কল্যাণীকে আচ্ছন্ন আবৃত করে রাখলো।

গুম্ গুম্ গুম্...

তীব্র হুইশেলের সঙ্গে সঙ্গে থর থর করে সমস্ত বারান্দাটা কেঁপে উঠল।

প্রচণ্ড শব্দ করে মেলট্রেনটা ছুটে চলে গেল। রেলের লাইনে লোহার চাকার ঘর্ষণে ঝমাঝম্ ঝমাঝম্ আওয়াজ কয়েক মুহূর্তের জন্যে কল্যাণীর চোখ-কান ধাঁধিয়ে দিল।

জানালায় বসে থাকা কতকগুলো অস্পষ্ট ঝাপসা মূর্তি ওর ব্যগ্র কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে বিদ্যুতের বিদারণ রেখার মতই ঝিলিক দিয়ে আবার দিগন্তরেখার ওপারে মিলিয়ে গেল।

এ ট্রেনটা দরকার না হলে এখানে থামে না।

ঝড়ের মত আসে। উল্কার মত ছুটে চলে যায়। রাজকীয় মহিমায়

ওর আসা-যাওয়া। এই দুর্বারগতি ট্রেনটা যেন এই অখ্যাত অবহেলিত নতুন তুচ্ছ পাহাড়ী গঞ্জ স্টেশনটার লাইন ছুঁয়েই একে ধন্য করে দিয়ে যায়।

সব শব্দ নিস্তব্ধতায় তলিয়ে গেল ট্রেন চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। এইবার অন্ধকার গাঢ় ও ঘন হতে থাকবে। সেই সঙ্গে শীতের কুয়াশা। সেই অন্ধকার আর কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে স্টেশনটা ঘুমিয়ে পড়বে সারা রাত্তিরের মত। সারা রাত তাদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিতে আর কোন ট্রেন আসবে না।

আসবে সেই ভোরবেলা।

আবছা অন্ধকারে দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরের লাইন দুটোকে কী অসহায়, কী নিঃসঙ্গ বলেই না মনে হচ্ছে! নিঃসঙ্গতা--একাকীত্বের যন্ত্রণা যে কি ভয়ঙ্কর, সেকথা কল্যাণীর চেয়ে বেশী আর কে জানে? লাইন দুটোর তবু আকাশ আছে, মাটি আছে, প্রান্তর বন পর্বত শহর নগর আছে। স্টেশনের পর স্টেশন আছে। লোকজন হৈ হট্টগোল আছে।

কিন্তু কল্যাণীর কি আছে?

চার দেয়াল দিয়ে ঘেরা ওই ইট-কাঠের খাঁচাখানা ছাড়া?

না, কিছু নেই। কেউ নেই। এক নিরবলম্ব শূন্যতা ছাড়া কল্যাণীর জীবন থেকে সব কিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে।

'কাকিমা!'

কল্যাণী চমকে উঠল। ওদিককার কোয়ার্টারের দেবেনবাবুর মেয়ে মিঠু। প্রশ্রয় পায় না, সমাদর অভ্যর্থনাও নয়। তবু আসে। বাড়ীতেও বারণ করে দেওয়া আছে। কিন্তু মিঠু ছেলেমানুষ বলে, মেয়েমানুষ বলে, বয়সের তুলনায় একটু বেশী পাকা বলেই বোধহয় ওর বড়দের বারণ না শোনবার ইচ্ছেটা প্রবল। এই সব কারণ ছাড়াও ওর এখানে আসার একটা গূঢ় কারণও আছে। কল্যাণী বড় বেশী সুন্দরী। কল্যাণীকে দেখতে ওর খুব ভাল লাগে। কথা বলতেও ভাল লাগে।

রূপসীর রূপ ছোটদের আকর্ষণ করে। পুরুষদের মুগ্ধ মোহিত মোহগ্রস্ত করে। আর স্ত্রীলোকদের হৃদয়ে ঈর্ষার আগুন জ্বালায়। সুন্দরী স্ত্রীলোক পুরুষদের যতটা আকর্ষণ করে, মেয়েদের কাছে তার চেয়ে অনেক বেশী বিকর্ষণের বস্তু হয়ে ওঠে।

'কাকিমা, তুমি একা একা বারান্দায় বসে কী করছ?' কথা বলতে বলতে মিঠু বারান্দার সিঁড়ির কাছে এগিয়ে এল।

'কী আর করব? বসে আছি।'

'একলা বসে থাকতে তোমার ভাল লাগে?'

মিঠুর কথার উত্তর না দিয়ে কল্যাণী একটু হাসল।

মিঠু স্থিরদৃষ্টিতে কল্যাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। ওর চোখে বিমুগ্ধ বিস্ময়। কাকীমাকে দেখতে কি সুন্দর! যেমন গায়ের রং তেমনই নিটোল গোল গোল মাখনের মত নরম হাত পা। বড় বড় কালো কালো চোখের পল্লবগুলো কী ঘন আর কালো! মনে হয় কাকিমা যেন দুচোখে কাজল এঁকেছে। ঠোঁট গাল দেখলে মনে হয় রং মেখেছে। কিন্তু মিঠু জানে কাকিমা সব সময় মাথায় ঘোমটা দিয়ে থাকে। এখন, অন্ধকার বলে, লোকজন নেই বলে মাথায় কাপড় নেই। কি সুন্দর ঘন চুল কাকিমার মাথায়! মিঠুদের বাড়ীতে ঘরের দেওয়ালে একটি সুন্দর মেয়ের ছবিওলা ক্যালেণ্ডার টাঙানো আছে। কল্যাণী-কাকিমা সেই ছবিটার মেয়েটার চেয়ে অনেক—অনেক সুন্দর।

ওর নিষ্পলক মুগ্ধদৃষ্টি লক্ষ্য করে লজ্জা পেয়ে কল্যাণী প্রশ্ন করল, 'কী দেখছ অমন করে?'

'তুমি কী সুন্দর! তোমার মাথায় ক—ত্তো চুল!'

'সত্যি?' কল্যাণীর মরচে-পড়া মনের সেতারে হঠাৎ নতুন করে ঝঙ্কার উঠল। 'সত্যি?'

'সত্যি সত্যি সত্যি। তিন সত্যি। তোমার মত সুন্দর মেয়ে কমলাপুরে আর নেই। সক্কলে একথা বলে।'

'তাই বুঝি?' কল্যাণী এবার শব্দ করে হেসে ফেলল। 'সক্কলে বলে! মিঠু, কে কে বলে, বল না?'

'বাবা সত্যেনকাকা পোস্টমাস্টার মশাই ডাক্তারবাবু—যারা যারা তোমায় দেখেছে, তারা।'

কল্যাণী হাসি বন্ধ করে মুখখানা খুব সরল করে আবার প্রশ্ন করল, 'আর তোমার মা কাকিমা পোস্টমাস্টার মশায়ের বৌ, ওরা আমাকে কি বলে মিঠু?'

মিঠু ফিক্ করে হেসে ফেলল। 'না বলব না। তুমি ওদের বলে দেবে!'

'তোমার যদি ইচ্ছা না হয়, বলো না।'

কল্যাণীর এই উদাসীনতায় মিঠু কিন্তু খুশী হল না। কল্যাণী সম্বন্ধে শোনা নানা ধরণের কথাগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত না তার কানে পেঁছয়, ততক্ষণ মিঠুর মনে শান্তি নেই। মিঠুর বয়স বছর দশ-এগারো হলেও, মেয়েমানুষের পাকা স্বভাবটি ইতিমধ্যেই তার মজ্জাগত হয়েছে।

তাই সে এগিয়ে এসে বারান্দার ওপর বসে থাকা কল্যাণীর গা ঘেঁষে দাঁড়াল। গলা নামিয়ে ফিস ফিস করে (যেন এখানে কেউ আছে, শুনে ফেলবে) বলল, 'তুমি ওদের কারুকে বলে দেবে না, বল?'

'আমি কি কারুর সঙ্গে কথা বলি, না কারু বাড়ী যাই?' কল্যাণী ওকে আশ্বস্ত করল, 'যে তোমার কাছে শোনা কথা অন্য কাউকে বলে দেব?'

মিঠু উৎসাহিত হল। তড়বড় করে বলতে লাগল, 'সেই জন্যেই তো—সেই জন্যেই তো ওদের তোমার ওপর অত রাগ। তুমি কারু সঙ্গে মেশো না, কারু বাড়ি বেড়াতে যাও না, তুমি সবচেয়ে সুন্দর, তাই তোমাকে সবাই নিন্দে করে, বলে, গাঁইয়া মুখ্যু, রূপের অহংকারে মাটিতে পা পড়ে না। দেমাকী। আরো কত কি।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ।' মিঠু সোৎসাহে ফুটন্ত খইয়ের মত ফট্ ফট্ করতে লাগল, 'পোস্টমাস্টার-কাকিমা, ডাক্তার-কাকিমা (এখানে মিঠু নিজের মায়ের নামটি বাদ দিল) ওরাও তোমার নামে নিন্দে করে। তুমি বোকা, হাঁদা, মাকাল ফল, কারু সঙ্গে মিশতে কথা কইতে জান না, লোকজন পছন্দ কর না—এই সব কথা বলে।'

'তা ওরা সত্যি কথাই তো বলে মিঠু।'

'মোটেই না। তুমি ওদের চেয়ে অনেক সুন্দর আর ভাল বলে ওরা নিন্দে করে।'

দশ-এগারো বছরের মেয়ের মুখের পাকা পাকা কথা শুনে কল্যাণী আশ্চর্য হল না। পরিবেশ মানুষের স্বভাবের জন্যে বিশেষ ভাবে দায়ী। তারই প্রভাবে মানুষ সহজ সরল হয়। আবার জটিল কুটিলও হয়। মিঠু যা দেখে যা শোনে তাই বলে। ওর দোষ কি? ভাল হওয়া অথবা মন্দ হওয়াটা সব সময় নিজের ওপর নির্ভর করে না। নিজের জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা কল্যাণীকে অনেক কিছু শিখিয়েছে।

গোধূলি এখন সন্ধ্যায় রূপান্তরিত। সবুজ গাছপালার মাথায় অন্ধকার ঘন হচ্ছে। ঝোপেঝাড়ে কীট-পতঙ্গের ডাক শুরু হয়ে গেছে।

কল্যাণী একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'মেয়েরা তো আমার আড়ালে আমার নামে নিন্দে করে, ছেলেরা করে না?'

'ছেলেরা! কোন্ ছেলেরা?' মিঠু কল্যাণীর কথাও ঠিক ধরতে পারল না।

'ছেলেরা মানে এই তোমার ডাক্তারবাবু, পোস্টমাস্টার মশাই, তোমার সত্যেন কাকা, মাস্টার মশাই হীরালালবাবু—ওঁরা কিছু বলেন না আমার নামে?'

'না—না, ওরা কিছু বলে না। কিন্তু ভবেনকাকাই তো—'

হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় ভবেনের নামটা করে ফেলে মিঠু যেন হোঁচট খেয়ে জিভ কামড়ে চুপ করে গেল।

কল্যাণী ওর হাত ধরল। কাছে বসাল। ওর মাথার এলোমেলো চুলগুলো গুছিয়ে দিতে দিতে শান্ত গলায় বলল, 'ভবেনকাকা কী মিঠু?'

'না—না কিছু না—' মিঠু ঢোঁক গিলল।

'তোমার ভবেনকাকা আমার নামে কি বলে মিঠু?' কল্যাণী ওর পিঠে হাত রাখল। 'তুমি না বললেও আমি জানি। ওঁদের সবার কাছে আমার নামে উনিও নিন্দে করেন। তুমি বলতে ভয় পাচ্ছিলে কেন? আমি তো একথা জানি। নিজের কানেও শুনেছি। অন্যের কাছ থেকেও শুনেছি।'

ধরা পড়ে গিয়ে সন্ত্রস্ত ভাবে ঘাড় নাড়ল মিঠু। 'না—না—নিন্দে করেন নি তো। শুধু সেদিন বাইরে ঘরে বসে ওদের সঙ্গে তাস খেলতে খেলতে কথায় কথায় বলছিলেন, আমার জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল একেবারে। বৌ সুন্দরী হলে কি হয়ও···র—ওর -'

মিঠু হঠাৎ চুপ করল।

'আমার মাথার দোষ আছে. এই তো?' কল্যাণীর বুকের মধ্যে ঝড়। কিন্তু মুখে হাসি। 'আমার হিস্টিরিয়া আছে। আমি লোকজন দেখলে রেগে যাই। আমি গেঁয়ো মুখ্যু—ঘরকুনো—এই তো? আমি পাগল, এই তো?'

মিঠু স্তম্ভিত। 'তু—তুমি কেমন করে জানলে ?'

'আমি হাত গুণতে জানি।'

'কিন্তু তুমি তো পাগল নও, তোমার কোন অসুখই নেই, তবে কেন ভবেনকাকা এসব কথা ওদের কাছে বলেন ?' মিঠুর কণ্ঠস্বরে দুচোখে গভীর বিস্ময়।

সহসা কল্যাণীর বড় বড় চোখ দুটো দপ্ দপ্ করে জ্বলে উঠল। কি একটা বলতে গিয়েও না বলে প্রাণপণে আত্মসংবরণ করতে লাগল কল্যাণী।

'তুমি কেন আমাদের বাড়ী যাও না ? ডাক্তারবাবুর বৌ নেমতন্ন করলেন, যাওনি। পোস্টমাস্টার-মাসিমা তোমার বাড়ি এসে কত করে তাদের বাড়ি যেতে বলে গিয়েছিলেন, তাও যাও নি। বাবুই পাহাড়ে সবাই পিকনিকে গেলেন, কত গান-বাজনা কত খেলাধুলো ঠাট্টা-তামাশা খাওয়া-দাওয়া হল। তুমি কেন গেলে না ? ভবেনকাকা কী হাসিখুশী, কত গল্প করেন, সকলের সঙ্গে মেশেন। মা মাসিমা কাকীমাদের সঙ্গে সব সময় ঠাট্টা-তামাসা করেন, অথচ তুমি—'

'আমি অহংকারী দেমাকী গেঁয়ো মূখ্যু পাগল মাথাখারাপ হয়ে ঘরের মধ্যে একা একা বসে থাকব বলে আমি বাইরে বেরুই না। বুঝতে পেরেছ মিঠু ?'

কল্যাণীর গলার স্বরে মিঠু চমকে উঠল।

'মিঠু, লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি এবার বাড়ী যাও। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তুমি এখানে এসেছ, কেউ যদি দেখতে পায় তবে তোমাকে বকবে। রাগারাগি করবে।'

মিঠুর আর ভাল লাগছিল না। ইচ্ছে হচ্ছিল, ছুটে এখনি এখান থেকে পালিয়ে যায়। মনে হচ্ছিল, কাকিমাকে এ সমস্ত কথা না বলাই উচিত ছিল। কিন্তু তবু চট করে উঠে যাওয়া যায় না বলে ক্ষীণ স্বরে বলল, 'না—না, কেউ বকবে না।'

'এখনি ভবেনকাকা গাড়ি পাস করিয়ে চলে আসবেন। উনি তোমাকে এখানে দেখতে পেলে নিশ্চয় তোমাদের বাড়ি গিয়ে বলে দেবেন।'

মিঠু আর দেরী করল না। ওর একটুও ভাল লাগছিল না। ও তাড়াতাড়ি উঠে প্রায় ছুটতে ছুটতেই গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অন্ধকারের মধ্যে মিট মিট করে জ্বলে ওঠা জোনাকিগুলোর দিকে তাকিয়ে কতক্ষণ বসেছিল কল্যাণী কে জানে।

চমকে উঠল ভবেনের পায়ের শব্দে ও বিরক্তিসূচক কণ্ঠস্বরে। 'ও কি? মাথার কাপড় ফেলে তুমি আবার বাইরের বারান্দায় এসে বসে আছ?'

এত অল্প সময়ের মধ্যেই ভবেন ফিরে এল কেমন করে? মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করল কল্যাণী।

কিন্তু না, কল্যাণীর ভুল হয়েছে। স্টেশন থেকে এই কোয়ার্টারটার দূরত্ব কল্যাণীর কাছে হাজার মাইল হলেও, ভবেনের কাছে চার-পাঁচ মিনিটের বেশী নয়। আর গাড়ি পাস করাতে কতক্ষণ সময়ই বা লাগে? অনেক সময় অ্যাসিস্ট্যান্ট্ স্টেশনমাস্টার অথবা পয়েন্টস্‌ম্যান শিউরতন ওরাও তো এই সামান্য কাজটা করে থাকে ভবেন না থাকলে।

'কতবার তোমাকে সাবধান করব বল তো?' জুতোর অসহিষ্ণু শব্দ তুলে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ভবেন আবার বলল, 'কতবার তোমাকে বলব, যখন তখন সদর বারান্দায় অমন ভাবে মাথার কাপড় ফেলে দাঁড়িয়ে বসে থেকো না। হাঁ করে দেখবার মত জিনিস এখানে কী আছে, ভেবে পাই না।'

'গাড়ি দেখছিলাম '

'গাড়ি কি একটা দেখার জিনিস না কি? আর তাও যদি হয়, ঘরের ভেতর থেকে জানালা দিয়ে বুঝি গাড়ি দেখা যায় না?'

'না যায় না। পর্দা সরালেও ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া পলাশ আর রিঠে ফলের গাছগুলোই শুধু চোখে পড়ে। বিশ্বাস না হয়, নিজে চোখে দেখ গে যাও।'

কল্যাণীর কণ্ঠস্বরের উত্তেজিত উত্তাপ ভবেনকে স্পর্শও করল না। গলাবন্ধ কোটটা আলনায় পাট করে রাখা ছিল। সেটা টেনে পরতে পরতে ও গজ গজ করতে লাগল, 'আসবার সময় দেখতে পেলাম ওদিককার কোয়ার্টারের বারান্দায় দেবেনবাবুর শালা আর কলকাতা থেকে আসা তার ভাগ্নিপোত তোমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।'

'কে কোথায় কার দিকে তাকিয়ে রয়েছে বলে আমি আমার নিজের ঘরের বারান্দায় একটু দাঁড়াতে বসতে পারব না? রাতদিন ওই খুপরি ঘর দুখানার ভেতর বসে থাকব?' কল্যাণী দপ্ করে জ্বলে উঠল। 'কেন, দেবেনবাবুর বৌ শালী বোন ওরা বাইরের বারান্দায় দাঁড়ায় না? ওদের কারু মাথায় তো কাপড় থাকে না। ওদের বেলায় দোষ হয় না? যত দোষ আমার বেলা?'

'হ্যাঁ, তোমার বেলাতেই দোষ হয়। কেন হয়, সেকথা তুমি ভাল করেই জান। কোয়ার্টারের সামনে দিয়েই স্টেশনে আসা-যাওয়ার রাস্তা। কলকাতা থেকে যারা আসা যাওয়া করে, তারা এই পথ দিয়েই যায়-আসে। তাছাড়া কলকাতার সেই বিখ্যাত গাইয়ে বসন্ত বোস, নন্দন চাটুজ্যে, স্বপন মজুমদার এদের এখানে আনা হয়েছে কালকের পিকনিকে গান গাইবার জন্যে। তারা স্টেশনে বেড়াতে এসেছিল। বলা যায় না তোমাকে দেখে ফেলেছে কিনা। দেখে ফেললে দোষ নেই, কিন্তু যদি কেউ চিনে ফেলে? তাহলেই তো সর্বনাশ। একবার ধরা পড়ে গেলে কেলেঙ্কারির সীমা-পরিসীমা থাকবে না। দুগালে চুন-কালি মেখে এ জায়গা থেকে চলে যেতে হবে, কাউকে মুখ দেখানো যাবে না। তোমার হয়তো তাতে কিছু আসবে যাবে না, কিন্তু আমার মান সম্মান ইজ্জত সব যাবে। উপরন্তু চাকরিটিও যাবে। বুঝলে?'

অতি তিক্ত অতি বিষাক্ত কথাগুলো আগুনের ছিটের মত কল্যাণীর সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে দিয়ে ভবেন টেবিলের ওপর রাখা জলের গেলাসটা এক চুমুকে শেষ করে ঘর থেকে আবার ছিটকে বাইরে বেরিয়ে এলো।

কল্যাণী উঠে দাঁড়াল। চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'দাঁড়াও!'

ওর কণ্ঠস্বরে কী ছিল, ভবেন থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হল।

'শুনে যাও।' কল্যাণীর গলায় আগুন। দুচোখে আগুন। 'ভাল করে কান পেতে শুনে যাও, এভাবে একটা চোরের মত জীবন কাটাতে আমি পারব না। তুমি আমাকে কারু সঙ্গে মিশতে দাও না। কোথাও যেতে দাও না। বাড়ী থেকে বারান্দায় পর্যন্ত বেরুতে দাও না। আমার মাথা খারাপ, আমি পাগল, গেঁয়ো মুখ্যু, আমি কারু সঙ্গে মিশতে কথা বলতে ভালবাসি

না, আমি লোকজন বাড়িতে আসা পছন্দ করি না। এই সমস্ত অতি জঘন্য বাজে মিথ্যে কথাগুলো তুমি বাইরে সকলের কাছে বলে বেড়াও। একটা জেলের কয়েদীরও তবু দুটো ভালমন্দ কথা বলবার মত সঙ্গী সাথী থাকে, কিন্তু আমার? এভাবেই যদি আমাকে অন্ধকূপে বন্দী করে রাখবে, তবে কেন ওখান থেকে লোক-দেখানো ঘটা করে বিয়ে করে এনেছিলে? কে তোমাকে পায়ে ধরে সেধেছিল!'

কল্যাণীর এই অশান্ত উত্তেজিত মূর্তি এত বছরের মধ্যে কখনো চোখে পড়েনি ভবেনের। অতি সংযত স্বল্পভাষিণী বাধ্য নম্র কল্যাণী রান্নাবান্না হাঁড়ী হেঁসেল ঘর সংসার আর ভবেনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্যেই যে রাতদিন ব্যতিব্যস্ত থাকে। ভবেনের একটু মাথা ধরলে শরীর খারাপ হলে, ও উতলা-আকুল হয়ে ওঠে। ভবেন কি খেতে ভালবাসে সব ও নিজের হাতে করে দেয়। প্রত্যেকদিন নতুন নতুন রান্নায় ও সিদ্ধহস্ত। ভবেনের জামাকাপড় অফিসের কাগজপত্র থেকে চমশা কলম জুতো মোজা সর্বদা ও ভবেনের হাতের কাছে ধরিয়ে দেয়। ঝগড়াঝাঁটি দূরে থাক, ভবেনের কথার ওপর উঁচু গলায় কথা পর্যন্ত ও বলে না।

হঠাৎ আজ তার এই রুদ্রমূর্তি ভবেনের কাছে অচিন্ত্যনীয়। তাই কল্যাণীর এই ভাবান্তরে বেশ একটু বিস্মিত না হয়ে পারল না ভবেন।

কল্যাণী সম্পর্কে সে নিরুদ্বেগ। নিশ্চিন্ত। কল্যাণীর মত মেয়ের যা প্রাপ্য, তার চেয়েও সহস্রগুণ বেশী ভবেন তাকে দিয়েছে—এই তার ধারণা। সে জানে কল্যাণী সুখী, মহাসুখী। ভবেন ছাড়া এত সুখী আর কেউ ওকে করতে পারত না। কল্যাণীর সব কিছু চাওয়া-পাওয়ার, সব কিছু সমস্যার সমাধান সে তো করেই দিয়েছে। তবে তার আবার হঠাৎ এমন রুদ্রমূর্তি কেন? এত রাগ কেন?

বোধহয় শরীর-টরীর খারাপ হয়েছে।

একথা ভেবে, মুখে একটু হাসি টেনে এনে, গলায় কিছুটা আদর ঢেলে প্রশ্ন করল, 'শরীরটা তোমার ভাল নেই মনে হচ্ছে।'

'শরীর আমার ভালই আছে।'

'তবে কী হয়েছে তোমার আজ বল তো? এতকাল তো বেশ ছিলে, আজ হঠাৎ সত্যি সত্যি মাথা খারাপ হল নাকি?'

'সত্যি যদি আমার মাথাটা খারাপ হত, ভালই হত। খুব-উব ভাল হত।' কল্যাণীর গলায় তীব্র বিদ্রূপের ঝাঁঝ। 'কিন্তু মাথা আমার খারাপ হয়নি। আর এতকাল আমি বেশ ছিলামও না। আমি কেমন আছি না আছি, ভুলেও কখনো সে খবর তুমি নিয়েছ? তুমি কেমন করে আমার অবস্থা বুঝবে? তোমাকে তো আমার জন্যে কিছু ছাড়তে হয়নি। তোমার বন্ধুবান্ধব গল্পগুজব খেলাধুলো, আমোদ-প্রমোদ আগে যেমন ছিল, আমাকে বিয়ে করার পর আরো অনেক বেড়েছে। তুমি তোমার বাইরের জগৎ নিয়ে ভালই আছ। আর আমি? তোমার জন্যে আমাকে সব ছাড়তে হয়েছে। হাসি কথা গান আমোদ আহ্লাদ—মানুষজন বন্ধুবান্ধব সব। একটা খুনী আসামীর মত, সেলের মধ্যে বন্দী হয়ে আমি শেষ দিনটার প্রতীক্ষা করে বসে আছি। এই কি আমার জীবন? আমি কি এই চেয়েছিলাম?'

'কী বলছ তুমি!'

'আমি ঠিকই বলছি। তুমি রাতদিন আমার কানে মন্ত্র পড়ছ—কল্যাণী তোমাকে আমি নরক থেকে স্বর্গে এনেছি। কিন্তু ভুল—মহাভুল। তুমি যদি আমাকে নরক থেকে এনেছ বলে মনে করে থাক, তবে একথা ভাল করেই জেনে রাখ, তোমার এই ঘর এই সংসার নরকের চেয়েও খারাপ লাগছে আমার কাছে।'

কল্যাণীর দুচোখে জল এসে পড়েছিল। গলার কাছে অজস্র কান্না জমা হয়ে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করে দিচ্ছিল। কিন্তু ভবেনের কাছে কোনমতেই তার এই দুর্বলতা প্রকাশ করা চলবে না, এই কারণে ও কোনমতে দাঁত দিয়ে ঠোঁট টিপে, কান্না সামলাতে সামলাতে বাথরুমের দিকে চলে গেল।

'মাথা খারাপ।'

কল্যাণীর চলে যাওয়ার দিকে ভ্রূক্ষেপও করল না ভবেন। সদর দরজাটা টেনে বন্ধ করে ও, বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়ল, 'দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যাও। আমার নেমতন্ন খেয়ে ফিরতে রাত হবে। রাত্রে খাব না।

তুমি খেয়ে শুয়ে পড়ো। আমি বুধনকে বলে দিয়েছি, যতক্ষণ না আমি ফিরে আসি ততক্ষণ ও এখানে এসে বসে থাকবে'খন। তোমাকে একা থাকতে হবে না।'

আবার যে একা—সেই একা।

দিনের পর আর একটা দিন শেষ হল। রাতের পর আর একটা রাত শেষ হবে। নিষ্প্রাণ নির্জনতার মধ্যে অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন কল্যাণীর জীবনে আর একটা দিন এগিয়ে আসবে।

কিন্তু সেই আগামী দিনটারও কোন রং, আলাদা কোন স্বাদ গন্ধ বর্ণ কিছুই থাকবে না। বিস্বাদ বিবর্ণ বিরস একঘেয়ে। সকাল থেকে সন্ধ্যে, ফের সন্ধ্যে থেকে সকাল। রবির পর সোম, সোমের পর মঙ্গল, তারপর বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি—তারপর আবার রবি।

এই ছক-বাঁধা অভ্যাসের পথে চলতে চলতে কল্যাণী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে একদিন।

আজ ভবেনের নিমন্ত্রণ। এই নতুন পাহাড়ী স্টেশনটায় অল্পসংখ্যক বাঙালী আছেন। একটা ক্লাবও আছে এখানে। সেই ক্লাবে আজ কলকাতা থেকে আগত বিখ্যাত 'রেডিও আর্টিস্ট' 'সিনেমা প্লে-ব্যাক' গাইয়েরা গান গাইবেন। খাওয়া-দাওয়াও হবে। তারপর ভবেন বাড়ী ফিরবে। ক্লান্ত হয়ে।

বাড়ি ফিরেই ভবেনের বিছানায় শুয়ে পড়ার অপেক্ষা মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুম। সমস্ত রাত অঘোরে অসাড়ে ঘুমোবে। ভবেন যেমন খেতে পারে, ঘুমোতেও পারে তেমনই। অত্যন্ত মোটা বুদ্ধি ও স্থূলরুচির মানুষরাই সাধারণত এমন হয়।

ভবেন না হয় কল্যাণীর রূপ-যৌবন, সেই সঙ্গে আরো অনেক কিছু দেখে ভুলেছিল। কিন্তু কল্যাণী ওর কী দেখে ভুলেছিল?

কেন কল্যাণী অন্ধের মত বেরিয়ে পড়েছিল ভবেনের হাত ধরে? কী

দেখে ? শুধু তার ঘরণী গৃহিণী হবার লোভে ? সংসার করবার লোভে ? সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার লোভে ? ভদ্রলোক হয়ে ভদ্রসমাজে মেলামেশা করবার লোভে ?

হ্যাঁ, তা ছাড়া আর কি ? না হলে ভবেনের মত পেটুক স্থূলরুচির মানুষকে কেন ও আঁকড়ে ধরেছিল, ওর চেয়ে ঢের সুপুরুষ অর্থশালী কমবয়সী শিক্ষিত পুরুষদের ত্যাগ করে ?

আশা মিটেছে ? শখ সাধ আকাঙ্ক্ষা সব মিটেছে ? না আরো কিছু বাকী আছে ?

ওই স্বার্থপর উদরসর্বস্ব আত্মসর্বস্ব পুরুষটা শুধু তার নিজের খাওয়া-দাওয়া, সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই—তার নিষ্ঠুর নির্মম উদ্দেশ্যকে সফল করে তুলতেই কল্যাণীর মাথায় সিঁদুর পরিয়ে বৌ সাজিয়ে এনেছিল। যথার্থই যদি ও কল্যাণীকে সহধর্মিনীর মর্যাদা দিত, তাহলে মাথা উঁচু করে ওকে নিয়ে সকলের সঙ্গে মেলামেশা করত। এমন করে ঘরবন্দী খাঁচার পাখী করে রাখত না।

কী ভীষণ খেতে ভালবাসে ভবেন !

আর এই খাওয়ার জন্যেই কল্যাণীকে ও রান্নাঘরে আটকে রাখার চমৎকার ফন্দী কাজে লাগিয়েছে।

প্রত্যেক দিন ও নিজে বাজার করবে। মাছ মাংস ডিম শাকসব্জী ছাড়া ও আরো অনেক জিনিস কিনবে। পিঠে পায়েস লেগেই আছে। তাছাড়া চপ কাটলেট ভেট্‌কি তপ্‌সের ফ্রাই ডিমের ডেভিল শিক-কাবাব প্রায় প্রত্যেক দিনই একএক রকমের খাবার ওকে করতেই হয় ভবেনের জন্যে।

শুধু ভবেন খেতে ভালবা স বলে ওর একার জন্যেই নয়। অল্প করেও নয়।

মাঝে মাঝে পরিমাণে বেশ অনেকটাই করতে হয় কল্যাণীকে, একলা হাতে প্রচুর পরিশ্রম করে। ভবেনের বন্ধুদের দেবার জন্যে।

ভবেনের ভারী মিশুকে স্বভাব। ও নিজেও গানবাজনা জানে। সব জায়গায় প্রায় সব বিশিষ্ট লোকেদের সঙ্গেই ওর মেলামেশা। বাড়িতে ও

বড় একটা কাউকে আসতে বলে না। খেতে বলে না। যেখানে যেখানে ও খেয়ে আসে, মাঝে মাঝে কল্যাণীকে দিয়ে ভাল ভাল খাবার তৈরী করিয়ে ও সেখানে সেখানে দিয়ে আসে। বন্ধু-বান্ধব সবাইকে ভাল করে খাইয়ে সন্তুষ্ট করে আসে।

কল্যাণীর হাতের রান্না নাকি খুব ভাল।

সবাই খেয়ে ধন্য ধন্য করে। ভবেনের স্ত্রী-ভাগ্যে হিংসে করে। শুধু রূপসী নয়। রন্ধনে দ্রৌপদী ও।

এক আধ দিন নয়।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর—

সোমের পর মঙ্গল, মঙ্গলের পর বুধ—ঠিক এক নিয়মে যন্ত্রের মতই ভবেন কল্যাণীর জীবনধারাকে এমন ভাবেই নিয়ন্ত্রিত পরিচালিত করেছে। প্রায় ছটা বছর ধরে কল্যাণী স্বাভাবিক নারীজীবন থেকে স্খলিত বিচ্যুত হয়ে যেন একটা অস্বাভাবিক ক্রীতদাসীর জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছে।

কিন্তু এতদিন যা হয়েছে, আজ আর তা হচ্ছে না। কোনমতেই সম্ভব হচ্ছে না কল্যাণীর পক্ষে। কল্যাণীর দেহ ক্লান্ত পরিশ্রান্ত।

আর মন!

মনের কথা না তোলাই ভাল।

ভবেনের কাছে কল্যাণীর মন বলে কোন বস্তুর অস্তিত্ব পর্যন্ত নেই। ভবেনের একটি সেবাদাসীর প্রয়োজন হয়েছিল। সমাজে বাস করতে হয় বলে, পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয় বলে, কল্যাণীর মাথায় সিঁদুর পরিয়ে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে ওকে সঙ্গে করে এনেছিল। ওর আন্তরিক বাসনা ছিল, কল্যাণী সদাসর্ব্বদা ওর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকবে। ওর সেবা-শুশ্রূষার জন্যে, রান্না-বাড়া ঘর-সংসারের কাজকর্মের জন্যে, ওর ক্ষুধা-তৃষ্ণার মত দৈহিক বাসনা মেটানোর জন্যেই কল্যাণীকে ওর প্রয়োজন হয়েছিল। ভবেনের ভালবাসায় গভীরতা ছিল না। প্রকৃত সহানুভূতি সমমর্মিতা ছিল না। একটা আত্মসর্বস্ব সঙ্কীর্ণচেতা অনুদার

মানুষ ভবেন ; নিজের সুখসুবিধা ছাড়া যে কখনো কল্যাণীর সুখদুঃখের কথা কোনদিনও চিন্তা করেনি ।

অথচ কল্যাণী ওকে মনে মনে কী শ্রদ্ধাই না করেছিল ! যখন ভবেন ওর মাসীর কাছে সোজাসুজি বিয়ের প্রস্তাব করেছিল ।

আর বিয়ের পর, কত উঁচু আসনেই না বসিয়েছিল ওই স্বার্থপর মানুষটাকে !

কী না করেছে কল্যাণী ওকে সুখী করার জন্যে !

কিন্তু তার বদলে ?

তার বদলে কী দিয়েছে ভবেন কল্যাণীকে ? কী পেয়েছে সে এই ছ' বছরে ? এক দুঃসহ নির্জনতায় কল্যাণী নিমজ্জিত । এমন এক অন্ধ-কূপে সে বন্দিনী, যেখানে বাইরের আলোবাতাস আসার একটা জানালা দূরে থাক, ছোট্ট একটা ঘুলঘুলি পর্যন্ত নেই ।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে রান্নাঘরের দরজায় শেকল তুলে দিল কল্যাণী । ভবেনের রাত্রে নেমতন্ন আছে । নিজের জন্যে রান্নার দরকার ওর কোন দিনও থাকে না । আজও তাই ও উনুনে আঁচ দিল না । এটা সেটা টুকটাক কাজকর্ম সেরে শোবার ঘরে ঢুকল ।

বড্ড ছোট ঘর । একখানা বড় ঘর পার্টিশন করে দুখানা ঘর করা হয়েছে । ওদিকেরটা বসবার ঘর । দুটো ঘরই আসবাবপত্রে ঠাসা । নড়বার জায়গা নেই । খাট আলমারি চেয়ার টেবিল আলনা বাক্স তোরঙ্গ তাক, আরো অনেক জিনিসপত্র ।

দরজা জানলা বন্ধ করলে কল্যাণীর সত্যি সত্যি দম বন্ধ হয়ে আসে । মানুষ মাত্র দুজন হলে কি হবে, দুটো ঘরের মালপত্র দেখলে মনে হবে মস্ত একটা সংসার ।

বন্ধ ঘরে যেন সত্যসত্যই তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে । এমন ভাবেই কল্যাণী আবার ঘর ছেড়ে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এল । খারাপ লাগছে। ভীষণ মন খারাপ লাগছে ওর এখন ।

মাথায় কাপড় দিল না ।

কেননা এখন অন্ধকার। অন্য লোক দূরের কথা, এখন ওকে খুব কাছে থেকে দেখতে পেলে ভবেনও মনে হয় চিনতে পারবে না।

ছোট পাহাড়ী স্টেশনটা নিঝুম হয়ে এসেছে। পথে আর তেমন মানুষজনের আসা-যাওয়া নেই।

স্টেশনের কাছে আরো নির্জন। যে কয়েক ঘর বাঙালী ভদ্রলোক এখানে আছেন, তাঁরা স্টেশন থেকে বেশ কিছুটা দূরে দূরেই থাকেন। ভবেনের সঙ্গে তাঁদের খুবই অন্তরঙ্গতা আছে। একটা ক্লাবও আছে। ভবেন নিজের কাজটুকু কোনক্রমে বজায় রেখে নিয়মিত সেখানে আড্ডা দিতে যায়। তাস খেলে। দল বেঁধে জংশন স্টেশনে সিনেমা-থিয়েটার দেখতে যায়। গান-বাজনার আসর বসায়।

কল্যাণী সেখানে অসূর্য্যম্পশ্যা।

কল্যাণীকে সঙ্গে করে ও কোথাও নিয়ে যায় না।

দূরে অন্ধকারে রেললাইন দুটোর দিকে স্থিরনিবদ্ধ দৃষ্টিটাকে আটকে রেখে কল্যাণী আবার বারান্দার সিঁড়ির ওপর বসে পড়ল।

গাছপালার ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে যাওয়া সরু পথটাকে এখন আর ভাল করে দেখাও যাচ্ছে না।

বিস্তৃত মাঠ, দূরে পাহাড়শ্রেণী, ছোট ছোট টিলা, উঁচু নীচু এবড়ো-খেবড়ো অসমতল জমি, শাল অর্জ্জুন রিঠে পলাশ মহুয়ার বৃক্ষশ্রেণী, আকাশে ফুটে ওঠা কয়েকটা তারার ঝকঝকানি, সব মিলিয়ে আবছা রেখায় রেখায়িত নিপুণ চিত্রশিল্পীর একখানি ধূসর রহস্যময় ছবির মত দেখাচ্ছে।

শব্দের মধ্যে কেবল ঝিঁঝিঁর ডাক, গুল্মলতার অধিবাসী কীটপতঙ্গদের বিচিত্র আওয়াজ, পাখির পাখার শব্দ ছাড়া মানবিক কোন সাড়াশব্দই এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না।

এই নির্জনতা, এই অন্ধকার, আর এই দুঃসহ একাকীত্ব—দিনের পর দিন কল্যাণীকে রূপরসগন্ধময় পৃথিবী ছাড়িয়ে অন্য এক অদ্ভুত উদাসীন বন্ধ্যা জগতে এনে ফেলেছে। এই নীরব নীরস জগতের সঙ্গে কয়েক বছর আগেও তার কোন পরিচয় ছিল না, সে জগৎ শব্দময় ধ্বনিময় তরঙ্গময় ছিল। দুঃখ ছিল, কিন্তু আনন্দও ছিল। সেখানকার পরিবেশ যেমনই

হোক না কেন, এই নির্জনতা, উদাসীনতা আর একাকীত্বের দুঃসহ বোঝা কল্যাণীর ঘাড়ে চাপানো ছিল না।

সেখানে ওর বন্ধু ছিল। সঙ্গী সঙ্গিনীরাও ছিল। প্রেম ছিল। আসল হোক নকল হোক, ভালবাসাও ছিল। সব মিলিয়ে একটা আশ্চর্য উন্মাদনাময় রোমাঞ্চময় উত্তেজক জীবন ছিল।

পূর্ণপাত্র সুরার মত সে জীবনে প্রমত্ততাও ছিল। উদ্দামতা ছিল। জীবনটাকে ভাল হোক মন্দ হোক একটা জীবন বলেই মনে হত।

কিন্তু এখানে ভবেনের কাছে, কিছু নেই। কেউ নেই। বিয়ের পর প্রথম বছরটা ভবেন কাছাকাছি ছিল। তারপর সে-ও কল্যাণীকে ত্যাগ করে ফিরে গেছে তার পুরনো পৃথিবীতে। অনেক দূরে।

শুধু মৃত্যুর নীরবতার মধ্যে ডুবে আছে কল্যাণী।

জীবন্ত রক্তমাংসের শরীর নিয়ে, সচেতন মন নিয়ে, তার কামনা বাসনা সব নিয়ে, এক সমাধির গহ্বরে বসে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে।

কল্যাণীর দুর্ভাগ্য, এই ছ'বছরে একটি সন্তানও ওকে এই নিরাসক্ত শীতলতা থেকে উত্তাপময় জীবনময় শব্দময় জগতে নিয়ে যেতে পারল না।

একটা ছেলে কি একটা মেয়েও যদি হত তার!

তাহলে হয়তো এই নির্জনতা, নির্জনতা বলে মনেই হত না কল্যাণীর। তার শূন্য পৃথিবী পূর্ণ হয়ে থাকত। তার ভাবনা-চিন্তা করার সময়ও থাকত না। তাকে কেন্দ্র করেই কল্যাণীর জগৎটা আবর্তিত হত। হয়তো ভবেনও তার প্রতি এতটা উদাসীন হয়ে থাকতে পারত না।

তাকে স্নান করানো, খাওয়ানো, গান গেয়ে ঘুম পাড়ানো, তার সহস্র রকম দুরন্তপনায় দুষ্টুমিতে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হত। নিজের কথা মনেই পড়ত না। না সুখ না দুঃখ—না অন্য কিছু।

মনে পড়ে গেল এখানে বদলি হয়ে আসবার আগে সেই পাণ্ডব-বর্জিত রাঢ় অঞ্চলের স্টেশনটার কথা। তাদের পাশের কোয়ার্টারেই থাকত চারুবালা। মাত্র কয়েক বছর বিয়ে হয়েছে, কোলে একটা তিন-চার বছরের ছেলে।

কী ভীষণ দুরন্ত দামাল ছিল সেই ছেলেটা! কল্যাণী তার নিজের ঘরে বসেই শুনতে পেত ছেলের মায়ের অনর্গল বকুনি আর চেঁচানি।

'এই সন্তু, কী হচ্ছে? খবরদার কাগজপত্রে হাত দিও না, এখুনি উনি এসে বকাবকি করবেন।'

'এই হতচ্ছাড়া ছেলে, কৌটোর সব পাউডার ঢেলে দিলি, এখন আমি কী করি? দাঁড়া তোর হাত ভেঙে দিচ্ছি। সব জিনিসে হাত দেওয়া বার করছি তোমার।'

'এই সন্তু ফের রান্নাঘরে এসেছিস? ওকি, খাবলা করে নুন নিচ্ছিস যে বড়? লক্ষ্মীসোনা রেখে দাও, মাণিক আমার কী কথা শোনে।'

'এইরে! ইঁদারার পাড়ে গিয়ে জল ঘাঁটছে! ওগো, দেখ না ছেলেটাকে। জল ঘেঁটে অসুখ করলে তখন তো আমাকেই দুষবে তুমি, একটা চড় মেরে ঘরে নিয়ে এসো হতচ্ছাড়া ছেলেকে।'

'ওই যা! নতুন চায়ের কাপটা ভাঙল! উঃ, কী দুষ্টু কী দুরন্ত হয়েছে ছেলেটা বাপরে বাপ্! দাঁড়াও, আসুন উনি, তারপর তোমাকে মজা দেখাব। আদর দিয়ে ছেলেকে বাঁদর তৈরী করানোর ফল নিজের চোখেই দেখুন এসে।'

'ওমা গো! আমার লক্ষ্মীঠাকুরের পুজোর বাতাসা তুই খেয়ে ফেললি! ওগো দেখ তোমার ছেলের কাণ্ড! আজ ওর হাড় আলাদা মাস আলাদা না করি তো আমার নাম চারুবালাই নয়....'

অনর্গল বকুনির সঙ্গে মাঝে মাঝে ছেলেটাকে মারবার জন্যে তেড়ে আসত চারুবালা রান্নাঘর থেকে অথবা অন্য কোথা থেকে। হাতের কাজ ফেলে, ভীষণ রেগে গিয়ে, বিরক্ত বিব্রত হয়ে।

কল্যাণী তখন ভয় পেত। আহা, অবুঝ অবোধ বাচ্চাটাকে দিলে বুঝি ঘা কতক বউটা! আরে বাপু মা হয়েছিস, একটু দুরন্তপনা সহ্য না করলে চলবে কেন? বাচ্চারাই তো দুষ্টুমি দৌরাত্ম্য করে থাকে। জ্ঞান-বুদ্ধি হলে কি আর করবে?

কিন্তু, না। মিথ্যেই ভয় পেত কল্যাণী।

মাঝে-সাঝে এক-আধ ঘা পড়লেও, বেশীর ভাগ সময়ে চারুর গলায় অন্য স্বর অন্য ভাষা শুনতে পেত কল্যাণী।

'আমার জাদু আমার সোনা আমার মানিক
...ধন ধন ধন।
বাড়িতে ফুলের বন,
এ ধন যার নেই তার কিসের জীবন ?
তারা কিসের গরব করে,
আগুনে পুড়ে কেন না মরে ?'

দেখে শুনে বড় লোভ হয়েছিল কল্যাণীর।

চার বছর হয়ে গেল তার বিয়ে হয়ে গেছে, তবু কেন তার কোলে এখনো কিছু আসার লক্ষণ দেখা দিচ্ছে না ?

একদিন রাত্রির নির্জনতায় ভবেনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের উত্তাপে উত্তপ্ত হয়ে কল্যাণী লজ্জারুণ কণ্ঠে ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল 'আচ্ছা আমরা তো বার্থকণ্ট্রোল করি না, তবু আমাদের ছেলে হচ্ছে না কেন, বল তো ?'

তৎক্ষণাৎ নির্লিপ্ত গলায় উত্তর এসেছিল, 'না হলে আর কী করা যাবে বল ? সব অদৃষ্ট।'

'অদৃষ্ট বলে হাল ছেড়ে দিচ্ছ কেন ?' কল্যাণী একটু অসন্তুষ্ট হয়ে বলেছিল, 'কলকাতায় গিয়ে ডাক্তার দেখালে হয় না ?'

'ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? দেখই না আর কিছু দিন।'

আরো কিছুদিনের জায়গায় আরো কয়েক মাস কেটে গেল। রূপমারি স্টেশন থেকে বদলির হুকুম এল কোমলাপুরে। তখন সময় বুঝে কল্যাণী ভবেনকে আবার স্মরণ করিয়ে দিলে কলকাতায় গিয়ে গাইনোকলজিস্ট দেখানোর কথা। কোমলাপুর যাবার পথে কলকাতায় ক'টা দিন কাটিয়ে, তারপর......

ভবেনের কিন্তু কোন উৎসাহই দেখা গেল না।

স্পষ্টই বলে ফেলল, 'ডাক্তারের কাছে গিয়ে শুধু দেখালেই তো হবে না, তোমাকে সব কথা খুলেও বলতে হবে।'

'সব কথা মানে ?'

'মানে বিয়ের আগে তুমি কী ছিলে, কেমন ছিলে এই সব কথা। তোমাদের ও লাইনের মেয়েদের ছেলেপুলে হয় না, একথা সবাই জানে। এতদিন যখন হয়নি, তখন ধরতে হবে...'

'বুঝেছি...থাক থাক, আর কিছু বলতে হবে না।'

এক অন্তর্ঘাতী বেদনায় নীল হয়ে গিয়ে দু' হাতে মুখ ঢেকে কল্যাণী ভবেনের চোখের সামনে থেকে সরে গিয়ে বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়েছিল।

ভবেনের কাছ থেকে এতবড় কথা শুনতে হবে একথা সে কখনো কল্পনা করেনি। তারপর থেকে সে আর এ বিষয়ে কোন কথাই ওকে বলেনি। ভবেন যে এতদূর অমানুষ হতে পারে, সে কথা চিন্তা করে করে ওর নিজের ওপরেই ঘেন্না এসে যাচ্ছিল।

দোষ ভবেনের নয়। সম্পূর্ণ তার নিজের। ও যদি সম্মতি না দিত, তাহলে ভবেনের কী ক্ষমতা ছিল ওকে এমন ভাবে করায়ত্ত করার? এমন ভাবে এই অন্ধকূপে বন্দী করে রাখবার?

একদিন ভবেন ওর একবিন্দু কৃপাকণার জন্যে, ওর একটু হাসি একটু কথার জন্যে একটা পোষা কুকুরের মত কল্যাণীর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে থাকত।

আর আজ?

আজ সেই কল্যাণী দাসীর—ক্রীতদাসীর অধম হয়ে ভবেনের পায়ের তলায় পড়ে আছে।

ভবেনের ভ্রূক্ষেপও নেই।

কিন্তু কেন? কোন স্বর্গসুখের আশায়?

এই কি জীবন?

এই জীবনের জন্যেই কি জবা পাগল হয়ে উঠেছিল? জবাকে খুন করে তাকে সমাধিস্থ করে 'কল্যাণী' হতে চেয়েছিল?

'জবা। তুমি ভুল করছো। মস্ত ভুল।'

কল্যাণীর বুকের ভেতর থেকে কে যেন কথা কয়ে উঠল। অনেক

দিন আগেকার পুরোনো কথা নতুন সুরে নতুন করে কল্যাণীর ঘা-টা পড়া মনটাকে প্রবলভাবে আলোড়িত আন্দোলিত করে তুলল।

'জবা তুমি ভুল পথে যাচ্ছ। ও পথ তোমার জন্যে নয়।'

'কে তুমি? তুমি কে?'

'তোমাকে যারা একদিন ভালবেসে ছিল, আমি তাদেরই একজন। আমি মানস দত্ত।'

'চিনতে পেরেছি। কিন্তু আমি ভুল পথে চলেছি, একথা বলছো কেন? বরং বলতে পার, এতদিন ভুল করেছিলাম, এখন সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে চলেছি, পবিত্র নিষ্কলঙ্ক হতে চলেছি।'

'কিন্তু তুমি কেন বুঝতে পারছ না, যে জীবনের লোভে তুমি তোমার অভ্যস্ত জীবন ছেড়ে চলে যাচ্ছ, সে জীবন তোমার জন্যে নয়। সে জীবনে তুমি সুখ-শান্তি কিছুই পাবে না।'

'তাই বুঝি? সেই জীবন, সে জীবনের সুখ শান্তি শুধু বুঝি তোমাদের মত আত্মসর্বস্ব লম্পট ভোগী লোভী পুরুষদের জন্যে? তোমরা বিয়ে করবে, বৌ নিয়ে সংসার করবে, আবার আমার মত বেশ্যাদের কাছেও নতুন সুখ পেতে আসবে? গাছেরও খাবে, তলারও কুড়োবে। তোমরা সুখী হতে পার, আমি পারি না?'

'আমরা সুখী? কে বলেছে? তোমার কাছে তো কত কত বড়লোক, কত গাড়িবাড়িওলা লক্ষপতি কোটিপতি বাবু আসে। তাদের কাছ থেকে তুমি কখনো শুনেছ, যে তারা সুখী?'

'হ্যাঁ, তারা সুখী। টাকা পয়সা রমনী, সব পেয়ে তারা সুখী। কিন্তু মুখ ফুটে সেকথা তারা বলে না। শুধু ইনিয়ে বিনিয়ে মিথ্যে কতকগুলো দুঃখের কথা বলে, আমাদের মত বাজারের মেয়েদের মন ভোলাতে চেষ্টা করে। কিন্তু তারা বুঝতেও পারে না, যে, তাদের এই সব বাজে মিথ্যে কথায় আমরা অভ্যস্ত।

'তুমি কি আমাকেও সেই ধরণের পুরুষ বলে মনে কর?'

'করি। তোমরা সবাই সমান। অন্তত এক জায়গায়।'

'জবা, তোমার ধারণা ভুল। আমি তোমার ভাল চাই, মঙ্গল চাই।

তোমার বয়স অল্প। তুমি বড় সুন্দরী। কিন্তু সমাজ সংসারের কিছুই জাননা। তুমি আলেয়ার পেছনে অন্ধের মত ছুটে চলেছ। দু'তিন বছরের মধ্যেই তোমার ভুল ভেঙ্গে যাবে। দূর থেকে তুমি যাকে আলো ভাবছো, কাছে গেলে দেখতে পাবে, সেটা আলো নয়। আলেয়া। সে আলেয়া তোমার সংসারকে স্নিগ্ধ প্রদীপ শিখার মত নরম আলোয় আলোকিত করে তুলবে না। কোনদিনও না। সেই জ্বলন্ত আগুনের দাহে তোমার ঘর পুড়বে, মন পুড়বে। এমন কি ওই কাঁচাসোনার মত সুন্দর শরীর, রূপ-যৌবন......সব নিঃশেষে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।'

'পুড়ুক, ছাই হোক। তবু সেই জীবনের স্বাদ আমি পেতে চাই। আমার বাবা আমার মাকে যে জীবনের স্বাদ নিতে, তাঁদের সুখী হতে দেখেছি, আমি তাই চাই।'

'জীবন! বোকা মেয়ে। জীবনের মানে তুমি কী জান?'

'Life is like an onion,
You Peal off Layer after Layer,
And then you find,
there is nothing in it.'

'কথাটার মানে কি, জান?'

'না জানিনা।'

'পেঁয়াজের খোসা ছাড়িয়েছ তো? জীবন হচ্ছে সেই রকম। যতই খোসা ছাড়াও, ছাড়াতে ছাড়াতে শেষ পর্যন্ত কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।'

'শুনলাম। জানলাম। কিন্তু তাতেই বা কী হল? পৃথিবীতে তো এমন ভাবেই কোটি কোটি মানুস বেঁচে থাকে? সংসার করে? বৌ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে সুখে-দুঃখে, হাসি-কান্নায় জীবন কাটায়? সকলের ভাগ্যেই যদি শেষ অবধি এই রকম হয়, আমারও হবে। তুমি, তোমরা হিংসুক স্বার্থপর লম্পটের জাত। আমি জানি তোমরা শুধু আমাদের কাছ থেকে এই চাও। শুধু আমাদের শরীরটা। আর কিচ্ছু নয়।'

'শুধু শরীর? না জবা না। ভালবাসাও চাই।'

'মিথ্যে কথা। আমাদের ভালবাসা না বাসায় তোমাদের কিছু আসে যায় না। তোমরা প্রজাপতির মত ফুলেফুলে মধু খেয়ে বেড়াও। আজ

এ ফুলে কাল ও ফুলে। এক মধু শেষ হয়ে গেলে, তাকে ত্যাগ করে অন্য কোথাও নতুন ফোটা ফুলের মধুর সন্ধানে উড়ে বেড়াও। এই যে তুমি, তোমরা পুরুষেরা হাজার বার লক্ষ বার আমাকে, আমাদের সবাইকে প্রেম ভালবাসার কথা শোনাও, তুমি কি ভাব, আমরা আমাদের এ লাইনের মেয়েরা সে কথা বিশ্বাস করি? না মোটেই করিনা।'

'তুমি যাদের চেন, আমি তাদের চেয়ে আলাদা।'

'মোটেই আলাদা নও। তুমি মানস দত্ত, মস্ত বড় লোকের ছেলে। ইউনিভার্সিটির দারুণ নামকরা ছাত্র ছিলে। তোমার বাবার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা— সব মিলিয়ে অগাধ সম্পত্তির তুমি একমাত্র উত্তরাধিকারী। অল্প বয়সে একটা খুব সুন্দরী মেয়েকে ভালবেসে তুমি উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলে। কিন্তু সে তোমাকে মোটেই ভালবাসতো না। তার নজর ছিল তোমার টাকার দিকে। যে ছেলেটিকে সে ভালবাসতো, একদিন তাকে নিয়ে সে পালিয়ে যায়। তাকে বিয়ে করে। তার এই বিশ্বাসঘাতকতায় তুমি পাগল হয়ে গিয়েছিলে। সেই নিদারুণ প্রত্যাখ্যান প্রবঞ্চনার যন্ত্রণা ভোলবার জন্যেই তুমি আমার কাছে আসো। ভালবাসার জন্যে নয়। সত্যি কথা বলতো, তুমি কি আমাকে ভালবাসো?'

'ভালবাসা? ভালবাসা কী জান?'

'বলনা, তোমার মুখ থেকেই শুনি।'

'আমি নিজেই কি জানি? তবু বলছি শোন—'

"And what is Love?
Hath ever man defined?—
So small a word, and yet so wonderful!
The sweetest of the mysteries enshrined
Within the temple of the
human soul—
A power no face can fetter
Time Control,
Whose mystic arms encircle
Land and Sea,
Lighting the great deeps of Eternity."

'তোমার কথা আমি শুনতে চাই না। বুঝতে চাইনা। আমি এই জীবন থেকে মুক্তি চাই—মুক্তি চাই—মুক্তি চাই—তুমি চলে যাও, আমার সামনে থেকে দূরে সরে যাও, দূর হয়ে যাও—'

'বেশ। আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু মাত্র কিছুদিনের জন্যে। আমি জানি, তোমাকে আবার এখানে ফিরে আসতে হবে। তখন আবার আমি তোমার কাছে আসবো। আবার তোমাকে ভালবাসবো। আবার তোমাকে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে, আদরে সোহাগে ভাসিয়ে দেব।'

মানস দত্তের ছায়া মিলিয়ে গেল।

জবাও অদৃশ্য হয়ে গেল।

আবার কল্যাণী তার একাকীত্বের যন্ত্রণা ও ভাবনার মাঝে নিঃশেষে তলিয়ে গেল, নিমগ্ন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

কতক্ষণ এভাবে বসেছিল কে জানে?

সহসা দূর থেকে ভেসে আসা একটা গুঞ্জন ধ্বনি…… কল্যাণীকে সচকিত আত্মস্থ করে তুলল।

একটা স্তিমিত লণ্ঠনের আলো দুলে দুলে গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে চলে যাচ্ছে। তাকে ঘিরে কয়েকটা ছায়াশরীর। এখানকার দেহাতের অধিবাসী কয়েকজন পুরুষ-রমণী। কে জানে কোথায় যাচ্ছে ওরা। কল্যাণীর ইচ্ছে হল চীৎকার করে ওদের ডাকে, ওদের সঙ্গে আবোল-তাবোল যাহোক দুচারটে কথা বলে ওদের কিছুক্ষণ তার কাছে আটকে রাখে।

কিন্তু সেই আলো, সেই মিশ্রিত গুঞ্জন তখনি অদৃশ্য হয়ে গেল। ঝুঁকে বসে থাকা শরীরটা টান টান করে আবার সোজা হয়ে বসল কল্যাণী। সময়গুলো কিছুতে কাটানো যায় না। ওরা যেন ভারী পাথর হয়ে কল্যাণীর বুকের ওপর চেপে বসে আছে।

সহসা অঘ্রাণের এক ঝাপ্টা কনকনে বাতাসে ওর সমস্ত শরীরটা শির্ শির্ করে উঠল। ঘরে গিয়ে গরম চাদরটা গায়ে দেবার কথা ভাবল কল্যাণী। কিন্তু তখনি মনে পড়ল, বাক্স থেকে ওটা বার করা হয়নি। শুধু গরম চাদরটাই নয়, ভবেনের গরম জামা কোট চাদর, ওগুলোও বার করতে হবে। বেশ শীত পড়ে গেছে।

'...মাসী...ঈ...তুমি কোথায় ? মাসী—ও মাসী...'

ওদিককার কোয়ার্টার থেকে মিঠুর কণ্ঠস্বর নির্জনতায় প্রতিধ্বনিত হয়ে ভেসে এল। সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ দমকা বাতাসে শির্ শির্ করে কেঁপে ওঠা পাতার মত কল্যাণী শিউরে উঠল। ওর মনে হল, মিঠু নয়, ওই কণ্ঠস্বর ওর নিজেরই। কল্যাণীর নিঃসঙ্গ অবচেতন মনের আর্তনাদ মিঠুর কণ্ঠস্বরের মধ্যেই ফুটে উঠেছে।

মাসী, তুমি কোথায়, মাসী তুমি কোথায় ?

মাসী। হ্যাঁ কল্যাণী—না-না কল্যাণী নয়, জবা। জবা মিসেস মালতীলতা সেনকে মাসী বলেই ডাকত।

সে কতকাল আগে ?

ছ'বছর ? না তারও আগে ? ছ'শো, ছ'হাজার, নাকি কোটি কোটি অর্বুদ নির্বুদ বছর আগে ?

সেই মাসী এখন কোথায় ?

চামেলী পারুল হেনা টগর মল্লিকা যূথি—

ওরা কি জবাকে ভুলে গেছে ? নাকি জবা সুখের স্বর্গে বাস করছে এই চিন্তায় তাদের বুকের ঈর্ষার জ্বলুনি-পুড়ুনিগুলো এখনো তেমন করেই ধিক্ ধিক্ করে ওদের জ্বালাচ্ছে পোড়াচ্ছে ?

খবরটা শুনেই ওরা, ফুলের নামে নাম মালতী মাসীর সেই মেয়েরা জবার একই লাইনের বন্ধুরা, জবার মত নষ্ট ভ্রষ্ট সমাজচ্যুত পতিত দুকূল খাওয়া টগর মল্লিকা হেনা যূথি চামেলী আর পারুল সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

বিস্ময়ের প্রবল ঝাপটায় (ঈর্ষাতেও বটে !) ওদের মুখগুলো কেমন কেমন ভাঙ্গাচোরা হয়ে উঠেছিল।

• অবশ্য এদের মধ্যে যূথিই বেশী সরল। বয়সেও ছোট। সেই আন্তরিক খুশী হয়ে উঠেছিল।

কথাটা শুনে দূর থেকে অবাক চোখে কিছুক্ষণ জবাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, হঠাৎ ছুটে গিয়ে ওকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আনন্দে ছলকে উঠেছিল। 'সত্যি ! জবাদি সত্যি ?'

'সত্যি সত্যি সত্যি। তিন সত্যি।'

'তুমি বিয়ে করবে? আসল বিয়ে?'

ভ্রূকুটি ভরে তার গাল টিপে জবা বললো, 'হ্যাঁ, আসল বিয়ে। বিয়ে আবার নকল হয় নাকিরে?'

'কাকে, বলনা জবাদি, কাকে?' যূথির কণ্ঠস্বরে কৌতূহল উপচে পড়ছিল।

'একজন পুরুষ মানুষকে।'

পারুল টিপ্পনি কাটল; 'একজন পুরুষকে তো বটেই। একটা মেয়ে হয়ে তুমি যে একটা মেয়ের গলায় মালা দেবেনা, সেকথা আমরা সবাই জানি। তা তিনি কোনটি, জানতে পারি কি?'

হেনার ঘরে বসে ওরা সবাই কথা বলছিল। বেলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এখন ওরা সবাই খুবই ব্যস্ত। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হেনা মুখে ফাউণ্ডেশন ঘষছিল। তার পাশে, একটা টুলের ওপর বসে মল্লিকা চুল আঁচড়াচ্ছিল। চামেলী টগর যূথির সাজগোজ মোটামুটি শেষ হয়ে গিয়েছিল। পারুল একমনে নতুন একখানা দামী শাড়ি পরতে সুরু করেছিল।

পারুলের কথা শুনে জবা যূথির কাছ থেকে সরে গিয়ে হেনার বিছানার ওপর বসে জবাব দিল, 'নিশ্চয় জানতে পারবি।' লুকিয়ে লুকিয়ে তো আর করছিনা। বিয়ে বলে কথা। হেনা, তুই তো কথায় কথায় ছড়া কাটিস। সেই যে একটা কথা বলিস না? ভারীতো বিয়ে, তার দু'পায়ে আলতা; আমি কিন্তু তেমন বিয়ে করব না। দুপায়ে ভালো করে, চওড়া করে আলতা পড়বো। নতুন গয়না গায়ে দেব। লাল বেনারসী পরবো। মাথায় টোপর দেব। পাঁচজন বন্ধু-বান্ধবকে নেমন্তন্ন করবো। ঘটা করে বর আসবে। সাতপাক ঘুরবো। বর মাথায় সিঁদুর পরিয়ে দেবে। লজ্জা-বস্ত্র দিয়ে মাথার ওপর ঘোমটা টেনে দেবে—।

হেনা ফাউণ্ডেশানের কৌটোটা টেবিলের ওপর রেখে ঘাড়ে গলায় পাউডার মাখতে মাখতে ছড়া কাটল—'কত সাধ যায় রে চিতে, মলের আগায় চুটকি দিতে। তা' আসল কথাটা বলনা বাপু, নাগরটি কে?'

চামেলী পান চিবোচ্ছিল। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে পিচ ফেলে চটুল

গলায় বললো, 'আমি বলবো ? কাকে তুমি বিয়ে করছো ?'

জবা ভ্রূভঙ্গি করে বললো, 'বল দেখি ? যদি ঠিক ঠিক বলতে পারিস, একশো টাকা বাজী।'

'সেই সিনেমা ডিরেক্টর রবীন চ্যাটার্জীকে ?'

'রবীন চ্যাটার্জীকে ? তাকে বিয়ে করার আগে আমার গলায় দেবার একগাছা দড়ি জুটবে না ?' জবা মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল।

'কেন ? বর হিসেবে সে খারাপ কিসে, শুনি ? দেখতে বেশ ভাল ! সিনেমাছবি তোলে। কত নাম। বিদেশে তার ছবি প্রাইজ পেয়েছে। গাড়ি আছে। বাড়ি আছে। ব্যাঙ্কে মেলা টাকাও আছে।'

'সেই সঙ্গে ডজন ডজন মেয়ে মানুষও আছে।' জবা মুখ বাঁকালো। 'সিনেমা অ্যাকট্রেস, হিরোইন, একস্ট্রা মেয়েরা। আজ একে নিয়ে মজা লুটছে। কাল ওকে নিয়ে। মেয়ে মানুষ খাবার যম। আমি ওর হাড়হদ্দ জানি না ? অমন পুরুষকে আর কেউ হিরোইন হবার লোভে বিয়ে করে করুকগে যাক। আমি সিনেমায় নামতেও চাই না। ও লোকটাকে বিয়েও করতে চাই না।'

টগর এবার বুঝিয়ে বলার ভঙ্গিতে জবাকে উদ্দেশ করে বললো, 'ওর তো বিয়েই হয়নি শুনেছি। বিয়ের আগে যা করেছে, করেছে। তা বলে বিয়ে হয়ে যাবার পরও এসব নোংরা কাজ করবে, একথা ভাবছিস কেন ? তুই ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দিতে পারবি না ? কী বলিস হেনা ?'

হেনা বিদ্রূপভরা গলায় ছড়া কাটল, 'কথায় বলেনা ? পড়লে শক্তের হাতে, সোজা করে তিন লাথে।'

'ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব ? তিন লাথে সোজা করবো ? মরে যাই মরে যাই, কি কথাই বললি তোরা ? এতদিন ধরে পুরুষ ঘাঁটছিস, তাদের রীতি প্রকৃতি চিনতে পারলি না ? ওরা কি সহজ সরল সোজা চীজ ? যে সব পুরুষের স্বভাব চরিত্র খারাপ, তাদের শোধরানো যায় ? যারা আমাদের মত মেয়েমানুষদের কাছে আসে, তাদের ঘরে বৌ নেই ? একটা মেয়েমানুষে তাদের মন বসে না। একটা ছেড়ে আরেকটা। মুখ বদল। মন বদল। আজ আমাকে। কাল যূথিকে। পরশু হেনাকে। তারপর দিন টগরকে। তার পরদিন সুযোগ সুবিধা পেলে, তার বন্ধুর বোন কি বৌকে। এমন কি,

নিজের বিধবা বৌদিকেও ছাড়ে না। কত দেখলাম! জানতে আর আমার বাকি নেই।'

যূথি হাঁ করে জবার কথা শুনছিল। ও থামতেই বোদ্ধার মত মুখ-ভঙ্গি করে বলে উঠল; 'তুমি ঠিক কথা বলেছ জবাদি। খাঁটি কথা। পরশু সাদা গাড়ি করে যে লোকটা আমার ঘরে এসেছিল না? সেই যে, তোমাদের বললাম, সুরেশ বাগ? সরষের তেলের কল আছে? লোকটা আমার কাছে কত বাক্ ফাট্টাই না করলো। ভোরে উঠে গঙ্গাস্নান করে। পূজো আচ্চা করে রোজ রোজ। অনেক টাকা দিয়ে মন্দির তৈরী করেছে। ঘরে বৌ, চার পাঁচটা ছেলে মেয়ে আছে। আবার এদিকে দেখ, লুকিয়ে লুকিয়ে বেশ্যা পাড়ায় আসে। আবার কথায় কথায় শুনতে পেলাম, বৌয়ের এক বিধবা দিদি আছে, মিন্‌সেটা তার সঙ্গেও নাকি নষ্ট। ছি ছি!'

যূথির কথা শুনে মল্লিকা চামেলী টগর নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করে, গলা ছেড়ে একসঙ্গে হেসে উঠল। হেনার ঘরের মধ্যে যেন এক ঝলক বসন্তের হাওয়া এলোমেলো বয়ে চলে গেল।

চিরুণী দিয়ে ঝুরো ঝুরো চুলগুলোকে কপালের উপর সুন্দর করে ছড়িয়ে দিতে দিতে, হেনা তীক্ষ্ণ চোখে আয়নার ভেতর দিয়ে জবার সুখী সুখী আলোভরা সুন্দর মুখের দিকে বার বার তাকিয়ে দেখছিল। দাঁতে ঠোঁট চাপছিল।

তীব্র একটা ঈর্ষার দাহ ক্রমশ ওর সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছিল। নিঃসন্দেহে জবা ওদের মধ্যে সব চেয়ে সুদেহিনী সুন্দরী। মালতী মাসী সবচেয়ে ওকে বেশী ভালবাসে। নিজের মেয়ের মত। মালতী মাসীর মুখের উপর কথা বলতে, কোন কিছুর প্রতিবাদ জানাতে একমাত্র জবাই পারে।

পারবে নাই বা কেন?

জবা নাকি মাত্র তের বছর থেকে মালতী মাসীর কাছে মানুষ হয়েছে। বেশ খানিকটা লেখাপড়াও ও শিখেছিল, এই তেরো বছর বয়সে। জবার মাকেও নাকি মালতী মাসী খুব ভালবাসতো। ওদের দারুণ বিপর্য্যয়ের

দিনে মালতী মাসীই ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সাহায্য করেছিল। আশ্রয় দিয়েছিল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই জবাও তো এই লাইনে এলো?

ওদেরই মত আজ একে, কাল ওকে শরীর বেচে জবাও তো টাকা রোজগার করে?

অবশ্য সে টাকার পরিমাণ হেনাদের চেয়ে অনেক বেশী। কেননা, মালতীমাসীর দামী দামী খদ্দের ওকে পেলে আর কাউকেই পাত্তা দেয় না। তাদের ঘরে ঢোকে না।

একই বাড়ির, একই লাইনের, একই পথের পথিক ওরা সাত সাতটা মেয়ে। সবাই বেশ্যা, সবাই নষ্ট ভ্রষ্ট, সংসার সমাজের বাইরের মেয়ে।

কিন্তু কপাল দেখ জবার!

ওর কপালেই সব সুখ।

চাইতে না চাইতেই ও সব পেয়ে যায়!

মোটা টাকার মানুষগুলো জবার জন্যে পাগল। ও ঘর সংসার করতে চেয়েছিল। স্বামী চেয়েছিল। এখন সবই ও মুঠোর মধ্যে পেতে চলেছে।

তারপর ছেলে মেয়ে।

সব মেয়েরা সারা মন প্রাণ দিয়ে যা কামনা করে, দু এক বছর বাদে তাও জবা হয়তো পেয়ে যাবে।

নিজের মনের এই ঈর্ষার জ্বালাটাকে কোনমতে চেপে রেখে ব্যঙ্গ ভরে আবার ছড়া কাটল:

'ওরে আমার ননী,
সাধ গিয়েছে খেতে তোর
উলুবেড়ের ফেনী!'

'তা, ভাই জবা, বাটা ডাল আর কত ফেনাবী? এই 'ফেনীটি' কে, তার নামটা বলেই ফেল না বাপু।'

বুদ্ধিমতী জবা ওর কথার প্যাঁচ, ওর মুখ চোখের ভাবভঙ্গি দেখেই ওর মনের ভাব বুঝতে পেরেছিল। ও কেন, সবাই জানে, হেনার স্বভাবটাই ওই ধরণের। অথচ হেনা কাজ কর্মে খুবই ভাল। বন্ধুদের দায় দরকারে আপদবিপদে ও এগিয়ে আসে। কারু অসুখ বিসুখ হলে, ও তার সেবা

করে। প্রয়োজন হলে রাত জাগে। টাকা ধার দেয়।

কিন্তু ওর হিংসাপ্রবৃত্তিটা বড় প্রবল। প্রাণপন চেষ্টা করেও ও ওর এই প্রবণতাকে চেপে রাখতে পারে না। টগর কি মল্লিকা অথবা জবারা কোন বাবুর কাছ থেকে ভাল শাড়ী ব্লাউজ, অন্য কোন দামী গয়নাটয়না উপহার পেলে অথবা বেশী টাকাকড়ি বখ্‌শিষ পেলেঁও হিংসেয় জ্বলে মরে। ক্যাট্‌ক্যাট্‌ করে ওদের কথা শোনায়।

ওকে নিয়ে আরো খানিকটা মজা করার জন্যে জবা হেসে হেসে টিপ্পনী কাটল ; 'তা তুই তো ভাই আমার বাবুদের প্রায় সবাইকেই চিনিস। আন্দাজ করে বলতো, কে হতে পারে ? যদি ঠিক ঠিক বলতে পারিস তাহলে তোর কাছেই আমি একশো টাকার বাজী হারবো।'

হেনা ঠোঁটে লিপস্টিক ঘষতে ঘষতে বললো ; 'নিশ্চয় সেই ইনসিওর কোম্পানীর ছোকরা বাবুটা।'

জবা ঘাড় নাড়ল ; 'উঁহু, ঠিক হল না।'

'তাহলে সেই কেশরীচাঁদ কটন মিলের হুকুমচাঁদ মেড়োটাকে। টাকার গদীর ওপর যে বসে থাকে।'

'হল না। একটা মেড়োকে আমি মোটেই বিয়ে করছি না। তার টাকার গদীই থাক, চাই টাকার পাহাড়ই থাক।'

'তাহলে সেই লেখাপড়া জানা পণ্ডিত লোকটা। সেই যে কোথাকার প্রফেসর...খুব পণ্ডিত...কি যেন নাম ? হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। মণি-মোহন রায়···তাকেই। 'তার বৌ নেই। দেখতে ভাল। তোকে খুব ভালবাসে। এইবার বল, ঠিক বলেছি কি না ?'

জবার হাসিমুখ মণিমোহনের কথায় ম্লান হয়ে গেল। গম্ভীর মুখে ও এবারও ঘাড় নাড়ল ; 'না। ও নয়।'

এবার চামেলী ফরফর করে উঠল ; 'আমি বলছি। সেই পানবাহার, লক্ষ্ণৌয়ের জর্দা আব তামাকের ব্যাবসা যার, সেই লোকটা। মোটা সোটা বেঁটে, মিশকাল চেহারা। চুনোট করা জরী পাড় ধুতি সিল্কের পাঞ্জাবী পরে। পায়ে চকচকে পামসু। হাতে নবরত্নের আংটি। গলায় একটা হারও আছে দেখেছি। ঢুলু ঢুলু ছোট ছোট চোখ। মস্ত বড় টাকের

চারপাশে একটুখানি চুলের বেড়া দেওয়া। কী জানি নামটা......মনে পড়ছেনা......'

জবা মজা পাচ্ছিল। মুখ টিপে হেসে উত্তর দিল; 'ধনপতি রায়।'

টগর বলে উঠল; 'লোকটার চেহারাটা ভাল নয়। কিন্তু দরাজ হাত। এইতো সেদিন তোকে একটা দামী পাথরের আংটি দিয়েছিল। লোকটার পয়সা আছে।'

হেনা মুখ বাঁকিয়ে ছড়া কাটল; 'যাক, বাজীটা তোরাই জিতলি। জবার হবুবর তাহলে ওই ধনপতি রায়।

ধনপতি রায়, পাকা ধান খায়,
একসের তামাক দিয়ে বৌ আনতে যায়।'

জবা এবার খিল খিল করে হেসে উঠল।

'হলনা হলনা। তোরা কেউ বলতে পারলি না। তামাক জর্দা বেচা ওই বেঁটে কাল মোটা বোকা হাঁদা লোকটার সঙ্গে মোটেই আমার বিয়ে হচ্ছেনা। ওই তো বিচ্ছিরি চেহারা। মাগোঃ! বিয়ের পর রোজ রোজ ওই রকম কুচ্ছিত লোকের সঙ্গে আমি বাপু এক বিছানায় শুতে পারব না। এ তো আর এক আধদিনের ব্যাপার নয়। স্বামী বলে কথা। একটু ভাল চেহারার মানুষ না হলে পরে মুশকিল হয়ে যাবে—না বাপু...তা হবে না...।'

'পরে কিসের মুশকিল হবে? বলনা জবা?' এবার মল্লিকা সকৌতূহলে জবাকে প্রশ্ন করলো।

'শুনলে তোরা হাসবি না তো? ঠাট্টা করবিনা তো?'

এবার টগর চামেলী পারুল এক সঙ্গে জবাকে ঘিরে ধরলো; 'আর ন্যাকামি করিসনি জবা ঢের হয়েছে। বেশী কচলালে লেবু তেতো হয়ে যায়। আসল কথাটা বলে ফেল।'

জবার মুখ এবার লাল হয়ে উঠল। চোখের দৃষ্টি আনত। কুণ্ঠিত লজ্জা বিজড়িত গলায় ও আস্তে আস্তে বললো; 'বুঝতে পারলিনা? বিয়ের পর আমারও তো অন্তত গোটা কতক ছেলে মেয়ে চাই। দু' তিনটে তো বটেই। ধর, যদি আমার ছেলে কিংবা মেয়ে যদি ওই কালো মোটা বেঁটে টেকো লোকটার মত দেখতে হয়, তাহলে? 'তাহলে কী হবে?'

পারুল ভুরু কুচকে বললো; 'বাপরে বাপ্! রাম না জন্মাতেই

রামায়ন। তোর ছেলেমেয়ে বিচ্ছিরি দেখতে হবে কেন? তুইতো সুন্দর। তোর মতই হবে।'

জবা বললো, 'না ভাই সেকথা বলা যায় না। বাপ যদি কুচ্ছিত হয়, ছেলেমেয়েরাও কুচ্ছিত হতে পারে। এ তো স্বাভাবিক ব্যাপার। কেলে কুচ্ছিত বেঁটে ছেলে মেয়ের মা হতে আমি পারব না। আমি যাকে বিয়ে করবো, সে কন্দর্পকান্তি না হোক, মোটামুটি ভাল চেহারার মানুষ হবে।'

'বেশ বাবা তাই হবে। এবার লোকটার নামটা বলে দে। ভয় নেই, আমরা কেউ ভাংচি দিয়ে তোর বিয়েটা ভেঙ্গে দেব না।'

টগরের কথায় জবা হাসলো। 'ভাংচি দিলেও কিছু হবে না। সে আমার সব কথা জেনে শুনেই আমাকে বিয়ে করছে। আর সত্যি কথা বলতে কি, লোকটা আমার পছন্দ সই, মনের মানুষ না হলেও, ভদ্রলোক। আমি যে একটা বাজারের মেয়ে, সেকথা জেনে শুনেও আমাকে যে ও বিয়ে করে ঘরে নিয়ে যেতে চেয়েছে, তাতেই আমি মনে মনে তার দাসী হয়ে গেছি। লোকটা এমন কিছু দেখতে শুনতে নয়, খুব একটা পয়সাওলা বড়লোকও নয়। খুব সাধারণ মানুষ। নাম হচ্ছে, ভবেন ভট্টাচার্য।'

'ভবেন ভট্টাচার্য! এ তো দেখছি বামুন। তা বামুন হয়েও, সব জেনে শুনে তোকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে যাবে? বলিস কি রে জবা?'

চামেলীর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই হেনা ফোড়ন মেরে ছড়া কাটল ঃ

'কখনো খেওনা ওলে আর ঘোলে,
কখনো ভুলনা, বামুনার বোলে।'

টগর বলে উঠল, 'তা হেনা অনেয্য বলেনি। দেখিস জবা, দুচার দিন মজা লুটে শেষ পর্যন্ত বামুন মিনসেটা তোকে তাড়িয়ে না দেয়।'

জবা হাসলো; 'তাড়িয়ে দেয়, দেবে। আমার অসুবিধেটা কিসের। দুচার দিন ঘরের বৌ হয়ে আমিও না হয় আমার সখসাধটা মিটিয়ে নেব। ব্যাঙ্কে টাকা জমিয়ে রেখেছি। জলেতো পড়ব না। তেমন হলে, তোদের কাছেই আবার ফিরে আসবো। মাসীর দরজা আমার জন্যে চিরদিন খোলা থাকবে।'

হেনা এবার একগাল হেসে জবার থুতনী ধরে আদর করে আহ্লাদী গলায় বললো, 'সেই ভাল। আমাদের কাছেই তুই ফিরে আসিস। তখন আমরা সবাই মিলে দেখে শুনে আর একটা ভাল বরের সঙ্গে আবার তোর বিয়ে দেব।

'বরের মাথায় চাঁপা ফুল
কনের মাথায় টাকা :
এমন বরের সঙ্গে বিয়ে দেব
গোঁফ জোড়াটি পাকা।'

হায় রে! ওরা যদি জানতে পারত কী সুখে জবার দিন কাটছে!

কু-লোকে যে যা ইচ্ছে বলুক। পৃথিবীতে কে আর কবে মানুষের মুখ বন্ধ করে রাখতে পেরেছে।

প্রচলিত প্রবাদবাক্যেই আছে, আড়ালে রাজার মাকেও লোকেরা ডাইনী বলে গাল-মন্দ করে থাকে। সুতরাং পরের কথায় কান দিতে নেই।

কে না জানে, সামাজিক মানুষের আদি ও অকৃত্রিম প্রবৃত্তি হচ্ছে পর-নিন্দা আর পরচর্চা।

তবে যে যাই বলুক, আড়ালে আড়ালেই বলে। মুখোমুখি মিসেস সেনকে দেখলে কিন্তু সত্যি সত্যি শ্রদ্ধা হয়।

ঘষা পেতলের মত চকচকে গায়ের রং। পরনে নানা রংয়ের আধুনিক ডিজাইনের পাড়ের সাদা পাতলা খোলের শাড়ি। গায়ে শাড়ির পাড়ের সঙ্গে ম্যাচ করে হাত কাটা ব্লাউজ। চোখে কালো ফ্রেমের রিমলেস চশমা। হাতে সোনার বালা। রিস্টওয়াচ। গলায় কখনো বিছে কখনো মফ্‌চেন, কখনো বা মটরমালা। কানে দুটি লাল পাথর।

মাঝে মাঝে অন্য কিছুও থাকে। পায়ে অল্পহিলের জুতো। হাতে বেশ বড় একটা ভ্যানিটি ব্যাগ। কাগজপত্রে ঠাসা। ফাইল, দলিল-দস্তাবেজ।

সব মিলিয়ে মালতী সেনকে মূর্তিমতী একজন সমাজ-সেবিকা বলেই মনে হয়। চেহারাটা যদিও স্লিম নয়, বরং একটু মোটার দিকেই বলা চলে। বয়সও কোন না পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন হবে। দু' একবছর বেশীও হতে পারে, তবে সেটা শরীরের শক্ত-সমর্থ বাঁধুনীর জন্যে বোঝা যায় না। স্বভাবটিও ভারী অমায়িক।

কিন্তু মোটা শরীর, অথবা বয়স বেশী হলে কী হবে? ওই বয়সে ওই রকম মোটাসোটা শরীর নিয়ে, অতবড় একটা ভারী ব্যাগ নিয়ে সকাল নেই বিকেল নেই, দুপুর নেই সন্ধ্যে নেই, মালতী সেন যেন চরকি পাক খেয়ে বেড়ান।

মেজর মিত্রর স্ত্রী দুচোখে প্রশংসার দীপ্তি ফুটিয়ে বলেন, 'ধন্য আপনি মিসেস সেন। পুরুষেরা যা পারে না আপনি তাই পারছেন দেখছি। এত ছুটোছুটি, এত খাটাখাটুনি, আশ্চর্য! তাও আবার নিজের জন্যে নয়।

মিসেস মিত্রের স্তুতিবাক্যে মালতী সেনের ভারী গালে পুলকিত হাসির ঢেউ ওঠে। চিবুকে খাঁজ পড়ে। 'ভগবান ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন, না পেরে উপায় কি বলুন ভাই?'

'তা বলে এত বড় দায়িত্ব নেওয়া কি সোজা কথা নাকি? পুরুষেরাই পারে না। মেয়ে ক'টাকে বরং অন্য কোনখানে, মানে কোন নারী-কল্যাণ আশ্রমে রাখলেই তো পারেন। ওরাই দেখে-শুনে ওদের বিয়ে-থার ব্যবস্থা—'

মেজর মিত্রের স্ত্রী শ্রীমতী রেণুকা মিত্রের মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে ব্যারিস্টার দত্তের স্ত্রী শ্রীমতী অশোকা দত্ত বলে ওঠেন, 'সত্যিই তো মিসেস সেন, নিজের ঘাড়ে কখনো এত বড় ঝঞ্ঝাট ঝামেলা ঝক্কি নিতে আছে? তাও আবার পরের ওপর, মানে চাঁদার ওপর নির্ভর করে? একটা সোমত্ত ভরবয়সের মেয়েকে আগলাতে সামলাতেই আমাদের বাপ-মায়ের কত অশান্তি, কত দুর্ভাবনা। আর আপনি সাত সাতটা যুবতী মেয়েকে—কি করে যে সামলে চলেন, ভেবেই আশ্চর্য হয়ে যাই আমরা। যতই ভালো হোক, বয়সকালের মেয়ে তো বটে।'

'উহু-হুঁ, অমন কথা আপনারা ভাই মেয়েমানুষ হয়ে আর বলবেন না!'

মিসেস সেন তাঁর ভারী মুখখানা আরো ভারী, গলাটা গম্ভীরতর করেন, 'কাগজ পড়েন না? অবিশ্যি কাগজে আর ক'টা খবরই বা বার

হয় ? কালে ভদ্রে আইন-আদালতের পৃষ্ঠায় দু একটা খবর ফাঁস হয়ে যায়, এই যা। ভেতরকার খবর সবই তো আমি জানি। শুনলে ভাই আপনারা শিউরে উঠবেন।'

'ভেতরকার খবর ?'

'ভেতরকার সত্যি সত্যি খবর। টাকার জোরে মুরুব্বীর জোরে সব পাপ সব কেলেংকারী চাপা পড়ে যায়। অসহায় গরীব দুঃখীর কথা কে আর কান পেতে শোনে বলুন ? নারী কল্যাণ অবলা-বান্ধব এই সব আশ্রমে কত কী নোংরামি হয় আপনারা সমাজের ওপরতলার মানুষরা কল্পনাও করতে পারবেন না। আমি সব জানি বলে নিজে থেকে জোর করে ওদের ওখানে রাখতে পারব না। নিজে থেকে চলে যেতে চায়, বেশ তো তাই যাক না। আমি কেন পাপের ভাগী হই বলুন ? কমলাকে রেখেই আমার যা আক্কেল হয়েছে, আবার ?'

'কমলা কে ? তাকে কোথায় রেখেছিলেন ? কী হয়েছিল তার ?' সমবেত মহিলাবৃন্দ অদম্য কৌতূহলে ফেটে পড়লেন।

ওষুধের ডোজ কোথায় কতটা দিতে হয় মালতী সেনের সব জানা। মানব চরিত্র বিশেষ করে মানবী-চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর প্রচুর অভিজ্ঞতা না থাকলে কি আর তিনি ধাপে ধাপে এতদূর উন্নতি করতে পারতেন ? সেই ধ্যাড়ধেড়ে গোবিন্দপুরের ইমামবাজারে গলির মুখে দাঁড়ানো আঙুরবালা আজ হাই সোসাইটিতে ছাড়পত্র পাওয়া মিসেস মালতী হতে পারতেন ?

ঘটনাটা কাল্পনিক হলেও বহু জায়গায় বহুবার বলার ফলে মালতী সেনের একেবারে সত্যিকারের ঘটনার মত মুখস্থ কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে। বলতে এতটুকু বাধেও না, আটকায়ও না।

তাই যথাসম্ভব মুখখানা করুণ করে তিনি তাঁর গ্রামের মেয়ে কমলার দুঃখের কাহিনী বেশ রসিয়ে রসিয়ে (নারীহৃদয় করুণায় বিগলিত হয় এমন ভাবে) বর্ণনা করেন। 'কমলাকে গুণ্ডায় ধরে নিয়ে গিয়েছিল। মাসখানেক পর ছাড়া পেয়ে পালিয়ে আসে। বাপের বাড়ি জায়গা হয়নি। কমলার বাবা মালতী সেনের দূর সম্পর্কের আত্মীয় বলে ভদ্রলোক তাঁর সাহায্য নিয়ে কমলাকে এখানকার একটি নাম করা নারী-কল্যাণ আশ্রমে রেখে যান। কমলা সুন্দরী, অল্পবয়সী। সেই অল্পবয়স আর রূপই

তার কাল হল। নারী-কল্যাণ আশ্রমে ভর্তি হবার পর ছ'টি মাসও কাটল না। হঠাৎ একদিন সকালবেলা কমলাকে খুঁজে পাওয়া গেল না।'

'খুঁজে পাওয়া গেল না?'

'না। ওখানকার কর্তৃপক্ষ আমাকে আর কমলার বাবাকে জানিয়ে দিলেন, তলে তলে কমলা নাকি কার সঙ্গে ভালবাসাবাসি করছিল তার সঙ্গে পালিয়ে গেছে। কমলার বাপ গ্রামের মানুষ। সরল সোজা। চোখ মুছতে মুছতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাড়ি চলে গেল। কিন্তু আমি তো অনেক ঘাটের জল খেয়েছি দিদি, অনেক আশ্রমের কাণ্ড-কারখানা আমার জানা। আমাকে ফাঁকি দেবে কেমন করে? তক্কে তক্কে রইলাম। ওরা বেড়ায় ডালে ডালে, আমি চলি পাতায় পাতায়। রাতদিন তো আর চাঁদার খাতা নিয়ে বড় বড় অফিসে, বড় বড় নামজাদা বাবুদের কাছে ঘোরাফেরা করছি না ভাই। আসল খবর জানতে দেরী হল না। কমলাকে ওরা অনেক টাকায় বিক্রী করে দিয়েছিল। একজন পাঞ্জাবীর কাছে।'

'পাঞ্জাবীর কাছে বিক্রী করে দিয়েছিল?'

'তবে আর বলছি কি।' মালতী সেন সখেদে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। 'শুধু কি পাঞ্জাবী? কত মেয়ে পাকিস্তানে চালান যাচ্ছে ওসব জায়গা থেকে, কেউ জানে? খবর রাখে?'

'কী সর্বনাশ! মেয়ে চালান দেয়? পাকিস্তানে?'

'শুধু কি আর পাঞ্জাবে, পাকিস্তানে? আরো কত জায়গায় তার কি ঠিক-ঠিকানা আছে দিদি? আপনারা ভালমানুষ। কত দয়া-মায়া শরীরে, আপনারা ভাবতেও পারবেন না। আপনাদের মত হাই সোসাইটিতে, হাই ফ্যামিলিতে আমি ঘোরাফেরা করি, আপনারা দশজনে আমায় চেনেন জানেন ভালবাসেন। মাস গেলে চাঁদা দেন, আমাকে বিশ্বাস করেন বলেই তো? এই ক'টা অল্পবয়সী মেয়েকে আমি তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, জেনেশুনে নিষ্ঠুরের মত জোর করে ওই সব জঘন্য জায়গায় পাঠাতে পারব না। ওরা আমাকে ঠিক মায়ের মতই ভালবাসে। আমাকে ছেড়ে কোথাও চলে যেতে ওরা চায় না। কাজ-কর্মও জুটিয়ে নিয়েছে ক'টা মেয়ে। ভাল রোজগার করছে। অফিসে বাইরে কারু সঙ্গে মেলামেশা করে ভাব ভালবাসা করে, করবে। আমিও তলে তলে

পাত্র খুঁজছি ভাই। তবে এ-সমস্ত মেয়েদের পাত্র পাওয়া কী কঠিন, বুঝতেই তো পারছেন। ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। আমি কে? উপলক্ষ্য বই তো নয়।'

'তা তো বটেই।'

'ওদেরও কোন চুলোয় কেউ নেই। আর আমারও তো সেই দশা। এক এক সময় মনে হয় ভগবান বোধ হয় ওদের দেখাশোনা করার জন্যেই আমাকে এমনভাবে নির্ঝঞ্ঝাট করে রেখেছেন। যতই হোক সোমত্ত বয়সের মেয়ে সব। ওদের জন্যে আমার ভারী অশান্তি। ভারী দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা।'

মিসেস সেনের গলা ধরে যায়। চোখ ছলছল করে। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে ছোট্ট ফুলতোলা রুমালখানা বার করে চোখ মুছতে মুছতে শ্রোত্রী ক'টির মুখে তাঁর এই লেকচারের প্রতিক্রিয়া নজর করে আবার বলেন, 'ওদের কথা ভাবলে এক একসময় বুকটা খালি হয়ে যায়। ওদের কী দোষ বলুন? আমাদের মত ভদ্রঘরেই তো জন্মেছিল। কেউ কেউ লেখাপড়া নাচ-গান বাজনা সবই শিখেছিল। তারপর পোড়া কপালের দোষে, হয়তো ভুল ত্রুটির ফলে আজ ওদের এই অবস্থা। কাউকে গুণ্ডায় ধরেছিল। কারোকে বা ফুসলে বার করে রাস্তায় বসিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। কেউ বা নিজেই পালিয়ে এসেছিল ঘর ছেড়ে। অল্পবয়সের দুটি বিধবাকে বিয়ের লোভ দেখিয়ে বার করে এনে শেষ পর্যন্ত—তার পরের অবস্থা তো বুঝতেই পারছেন। মেয়েগুলো অথই জলে হাবুডুবু খাচ্ছে। যায়ই বা কোথায়, করেই বা কি? আশ্রয়ই বা দেয় কে? বলুন তো আজ ওদের এই অবস্থার জন্যে দায়ী কে? আমাদের এই সমাজ। আর এই সমাজটাই বা কি? আমরা। আপনি আমি সবাই মিলেই তো এই সমাজ। সবাই যদি দায়িত্ব এড়িয়ে যাই, তাহলে কি চলে? আপনিই বলুন না শুভলক্ষ্মী দিদি, আমি কি মিথ্যে কথা বলছি?'

ইলেকট্রিক্যাল টুলস্ এ্যাণ্ড মেসিনারীজ-এর ম্যানেজার মিঃ খেমচাঁদের মিসেস শ্রীমতী শুভলক্ষ্মী এতক্ষণ মালতী সেনের সুদীর্ঘ আবেগময়ী ভাষণ ফলো করবার চেষ্টা করছিলেন। অকস্মাৎ তাঁর প্রতি এই আকস্মিক আক্রমণে থতমত খেয়ে ভাঙা বাংলায় জবাব দিলেন, 'নিশ্‌চোয় নিশ্‌চোয়,

এতো সাচ্চা বাতই আছে, হামাদেরই তো সব দোষ আছে। বিলকুল ঠিক কথা।'

আরো উৎসাহিত আরো উজ্জীবিত হলেন মালতী সেন শুভলক্ষ্মীর মত মোটা চাঁদা-দেনেওলা মহীয়সী মহিলার সাপোর্টে। 'মেয়েরা যে দোষ অন্যায় করে না; সে কথা অবশ্য আমি বলছি না। কিন্তু ওদের অন্যায় তো সমাজের অন্যায়ের ফলাফল। সামাজিক অর্থনৈতিক কারণগুলো ভাল করে তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় কেন আজ ওদের এই অধঃপতন। যাই হোক, আপনারা আমার মেয়েদের আশীর্বাদ করুন। অতীতে যাই করে থাকুক, ওদের ভবিষ্যৎ যেন অন্ধকার না হয়ে যায়। আমি যেন ওদের সৎপথে রেখে সুপাত্রে বিয়ে দিয়ে যেতে পারি। জীবন প্রতিষ্ঠিত করতে পারি।'

'নিশ্চয় নিশ্চয়, আপনার মত ভালমানুষের সদিচ্ছা সফল হবেই।' এবার সহানুভূতির সঙ্গে সায় দেন আই. এ. এস. গৃহিণী মাধবী চন্দ। 'সত্যি, সাধারণ মেয়ে হলে কি আর এতবড় দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে নিতে পারত? আপনি না দেখা-শোনা করলে ওদের কী দুর্দশাই না হত! সত্যি আপনার গুণের তুলনা হয় না মিসেস সেন। এদেশ বলে আপনার কোন নাম নেই, হত বিলেত কি আমেরিকা, কাগজে কাগজে আপনার ছবি ছাপা হত। কত প্রশংসা বেরুতো। গভর্ণমেণ্ট নিজে থেকে সাহায্য করতেন। কত বড় ভাল একটা প্রতিষ্ঠান আপনি গড়ে তুলতে পারতেন।'

'থাক ভাই থাক। আমার নাম ধাম খ্যাতি প্রতিপত্তিতে কাজ নেই। আজই আমার না হয় এই অবস্থা। কিন্তু কত বড় ফ্যামিলির মেয়ে আমি। কত বড় ফ্যামিলিতে আমার বিয়ে হয়েছিল সে কথা আপনারা না জানলেও আমি তো আর ভুলে যাইনি। অল্প বয়সে বিধবা হয়ে কত দুঃখ-কষ্ট পেয়েছি তাও মনে আছে। আপনারা আমাকে ভালবাসেন। দুটো ভাল-মন্দ কথা বলেন। যে যেমন পারেন চাঁদা দেন, তাই আমার যথেষ্ট। আমি তো জানি অল্পবয়সের মেয়েদের সামনে কত প্রলোভন। নীচে নেমে তলিয়ে যেতে দেরী হয় না ভাই। কিন্তু ওপরে উঠতে সাহায্য করার মত হাত পাওয়া ভারী শক্ত।'

মালতী সেন বড় বড় কথা বলতে জানেন বৈকি।

অনেক বড় বড় জায়গায় তাঁকে যেতে হয়। অনেক মান্যগণ্য মানুষদের সঙ্গে তাঁকে মেলামেশা করতে হয়। অর্থনীতি সমাজ-সেবা নৈতিক আদর্শ মান-উন্নয়ন ইত্যাদি কতকগুলো বড় বড় কথা তাঁকে সদা সর্বদাই ঠোঁটস্থ করে রাখতে হয়।

সহায় নেই (তবে একেবারে নিঃসহায়ও নন, কারণ...), তেমন কিছু অর্থশালিনীও নন। শহরের শেষ প্রান্তের নিরালা নির্জন নতুন পাড়ার তাঁর এই বাড়িটার গায়ে 'নারী-কল্যাণ অথবা অবলা-বান্ধব' এই গোছের লেবেল মারাও নেই। তবু কোথা থেকে যে গোটা কতক আশ্রয়হীন অল্পবয়সের মেয়ে তাঁর কাছে এসে জুটেছে সেটাও যেন একটা রহস্যের ব্যাপার।

তবে এ রহস্য নিয়ে কেউ বড় একটা মাথা ঘামায় না। মিসেস চন্দ মিসেস মিত্র মিসেস খেমকাদের মত অ্যারিস্টোক্র্যাট মহিলারা কখনো উঁকিও মারতে আসেন না মালতী সেনের বাড়িতে। পেছনে ও'রা মালতী সেনের সম্বন্ধে যাই বলুন না কেন, সামনে ও'কে সবাই মুখে মুখে অন্তত খাতির করে থাকেন। মালতী সেনের সে ব্যক্তিত্বটুকু ভালই আছে। আড়ালে তাঁকে কে কি বলল না বলল, তাতে ও'র কিছুই আসে যায় না। কেন না রাজার মাকে ডাইনী বলার প্রবাদবাক্যটা উনি ভাল করেই হৃদয়ঙ্গম করে বসে আছেন। চাঁদার টাকাটা নিয়ে কথা। সেটা যথাসময়ে হাতে পেয়ে গেলেই তিনি নিশ্চিন্ত।

তারপর যে যা ইচ্ছে বলে বলুকগে, বয়েই গেল মালতী সেনের।

অল্পবয়সের ভারী সুশ্রী চেহারাব সাতটি যুবতী মেয়ে।

চামেলী পারুল জবা যূথি হেনা টগর মল্লিকা—

অবশ্য এমন ফুলের নামে সাজানো নাম নিয়ে ওরা কেউ এ-বাড়ি আসেনি। এ-বাড়ি অর্থাৎ এই 'মালতী-নিবাসে' ঢোকার পর থেকেই ওদের পুরনো নামগুলো সব বাতিল হয়ে গেছে। নতুন নামে এদের ভূষিত করেছেন মালতী সেন নিজেই।

ঘরে বাইরে মালতী সেনের দুটো আলাদা আলাদা পরিচয়। দুই মূর্তি। দুই সত্তা। বাইরের লোক শুধু ওর নম্র বিনয়ী পরোপকারী মহাশয়া মূর্তিটিকেই চেনে। সেখানে উনি ভদ্র সম্ভ্রান্ত অমায়িক মহিলা। কিন্তু ও'র নিজস্ব এলাকায়, বাড়ীর ভিতরে ও'র অন্য রকম চেহারা।

সেখানে ও'র মুখোশ খোলা নগ্ন চেহারা দেখে মেয়েরা ভয় পায়। ও'র মুখের কথাই সেখানে আইন। আর সে আইন লঙ্ঘন করার মত বুকের পাটা একমাত্র জবা ছাড়া আর কারুরই নেই।

এমন একটি দিনও বাদ যায় না, যেদিন ও'র মুখের বাণী কোন না কোন মেয়েকে শুনতে হয়। অবাধ্য হলেই তাকে বেশ কট্‌ কট্‌ করে মালতী সেন স্পষ্ট কথা শুনিয়ে দেবেন।

'আমার বাড়িতে আমার কথামত চলতে না পারলে এখানে থাকা চলবে না। আমি কাউকে ধরেও রাখিনি। যেখানে মাথায় করে রাখবে, সেখানে চলে যাও। তোমাদের চেয়ে ঢের ঢের ভাল মেয়ের আমার অভাব হবে না। আমার এখানে আসবার জন্যে, থাকবার জন্যে কত ভদ্দোর ঘরের মেয়েরা পর্যন্ত আমাকে কত খোসামোদ করছে। নেহাত বাড়িটা ছোট, সব ক'টা ঘর তোমাদের ছেড়ে দিয়ে বসে আছি তাই। নইলে—'

ঝগড়া করতে করতেই এক সময় একটা ক্ষোভের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন মালতী সেন।

হায় হায়! বাড়িটা যদি আর একটু বড় হত!

আরো খানকতক ঘর যদি থাকত!

তাহলে আরো ক'টা মেয়েকে রেখে পরোপকারের মহৎ ব্যবসাটা ফলাও করে করা যেত।

অবিশ্যি বড় বাড়ি কি আর পাওয়া যায় না এই শহরে।

যায় বই কি। খুব যায়। কিন্তু বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে বেশী লাভ করতে গিয়ে ফেঁসে গেলেই মালতী সেনের সুনামের বারোটা বেজে যাবে। পুলিসের হাঙ্গামায় পড়তে হবে। সব জানাজানি হয়ে যাবে। মালতী সেনের সৌম্য সুন্দর সম্ভ্রান্ত অভিজাত দয়াময়ী মূর্তিটা কালি মাখামাখি হয়ে গিয়ে একেবারে সারা গায়ে নর্দমার পাঁকের গন্ধ ছড়াবে।

অতি চতুর, লোকচরিত্র-অভিজ্ঞা মালতী সেন সদাসর্বদা সেই কথাটি

স্মরণ রেখে বুঝে সুঝে সমঝে চলেন। এই সাতটি মেয়েকে নিয়ে, অপ্রসন্ন মনেই সন্তুষ্ট হয়ে থাকতে হয় তাঁকে।

অবশ্য এদের ওপর মাঝে মাঝে অতিরিক্ত কাজের চাপ পড়ে।

ওরা অসন্তুষ্ট হয়। কেউ কান্নাকাটিও করে। নিজেদের মধ্যে বলাবলিও করে। কিন্তু মালতী সেন গ্রাহ্যও করেন না। এ সমস্ত বিদ্রোহের মূলোচ্ছেদের অস্ত্র তাঁর হাতে মুখে সদাসর্বদাই উদ্যত হয়ে থাকে। 'নিজেদের ইচ্ছেমত চলতে চাও বাছারা, অন্য জায়গা খুঁজে নাও। চিৎপুর হাড়কাটা রামবাগানে অনেক জায়গা মিলবে। তবে সেখানে এমন সম্মানটি জুটবে না। গলির মোড়ে গিয়ে রোজ দাঁড়াতে হবে। এখানে পড়েই বা আছ কেন বুঝি না। আমি তো কারু হাতে পায়ে শেকল পরিয়ে রাখিনি। না জান লেখাপড়া, যে চাকরি করে খাবে। বিয়ে করে নিয়ে গিয়ে কেউ খেতে পরতেও দেবে না। বসিয়ে বসিয়ে তোমাদের আমি খাওয়াতে পারব না। ভাল না লাগে যে যার পথ দেখ, আমার ঘর ছেড়ে দাও। আমার বাড়ি খালি থাকবে না। ভাত ছড়ালে আবার কাকের অভাব, হুঁঃ!'

ভাত ছড়ালে যে সত্যিই কাকের অভাব হয় না, একথা ওরা মর্মে মর্মে জানে।

আরো জানে মাসির ঘর খালি থাকবে না। এ ব্যবসাতেও জোর প্রতিযোগিতা আছে। অনেকেই জানে, বাজারে মালতী সেনের সুনাম আছে, প্রতিষ্ঠা আছে। তাঁর মেয়ে অথবা বোনঝিদের ভদ্র শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বলে গুজবও আছে। সে কারণে ছোটখাটো চুনোপুঁটিরা আমলই পায় না তাঁর কাছে।

সবচেয়ে বড় কথা, তারা এটুকু ভালভাবেই জানে মাসী যা বলে একেবারে মিথ্যে নয়। কোন চুলোয় যাবার জায়গা তাদের নেই। কেউ তাদের আশ্রয় দেবে না। সাহায্য করবে না।

এখানে তারা তাদের অবস্থায় পড়া দুর্ভাগিনী মেয়েদের চেয়ে অনেক ভাল আছে, অনেক সুখে আছে। অন্তত সেজে গুজে পেট চালাবার জন্য তাদের প্রত্যেক দিন মক্কেল পাকড়াবার জন্যে গলির মোড়ে গিয়ে দাঁড়াতে হয় না। সে ব্যবস্থাটাও মাসী নিজে করে দেয়।

তাই, বেশী বাড়াবাড়ি করতে, বিদ্রোহ করতে, তারা সাহস পায় না। মাসীর জুলুম মুখ বুজেই সহ্য করতে চেষ্টা করে।

শুধু জবা ছাড়া। জবা মাসীকে খুব একটা ভয় করে না।

জবা মালতী সেনের সপ্তকন্যার সেরা কন্যা। সবচেয়ে সুন্দর ফুলটি। সবচেয়ে যৌবনবতী সুদেহিনী বুদ্ধিমতী। সবচেয়ে রূপসী মধুরহাসিনী। ওর এতগুলো গুণ আছে বলেই বোধ হয় মালতী সেন জবার মুখরতা আর ঔদ্ধত্য সহ্য করেন।

তাছাড়াও জবার মায়ের সঙ্গে মালতী সেনের একটু বেশী রকম অন্তরঙ্গতা, আর ঘনিষ্ঠতা ছিল। মরবার আগে জবার মা মালতী সেনের হাতেই মেয়ের ভার দিয়ে গিয়েছিল। মালতী সেনের হাতে পড়ে জবার অনেক শিক্ষা-দীক্ষা হয়েছে। ওকে ভালবাসেন বলে ওর ওপর মালতী সেনের দুর্বলতাও একটু বেশী।

মেয়েরা সবাই মালতী সেনকে মাসী বলেই ডাকে।

সেদিন মাসী জবাকে বোঝানোর ভঙ্গিতে মৃদু তিরস্কার করছিলেন, 'হ্যাঁরে জবা, তুই নাকি সেদিন মেহতাকে খুব অপমান করেছিস? ধাক্কা মেরে খাট থেকে ফেলে দিয়েছিস? ছি ছি, শুনে আমি লজ্জায় মরে যাই। আমি বলে কত প্রশংসা করলাম তোর ওর কাছে, তাই শুনে ও ডবল রেটে তোকে নিয়ে গেল, আর তুই কিনা শেষকালে ওইরকম খারাপ ব্যাভার করলি অমন পয়সাওলা লোকটার সঙ্গে?'

সেই নোংরা ঘটনাটার কথা মনে পড়ে যাওয়ায় জবা ফোঁস করে ওঠে, 'বেশ করেছি খারাপ ব্যবহার করেছি। বেশ করেছি লাথি মেরে ওকে খাট থেকে ফেলে দিয়েছি। ও কেন ওর কথার খেলাপ করল? এক রকম কথা বলে নিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত অন্যরকম সুর ধরল? আবার বলে কি কাপড় জামা সব খুলে ফেলে ওকে নাচ দেখাতে হবে! হাড় বদমাস বুড়োটা! ফের যদি তুমি ওটাকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দাও তাহলে আমি ওর গলা টিপে দেব। ন্যাংটো নাচ দেখার শখ বুড়ো শকুনির। তবু যদি বয়সটা একটু কম হত।

'তোর বড্ড বাড় বেড়েছে জবা! রূপযৌবনের অহংকারে ধরাকে সরা জ্ঞান করছিস, তেজে মটমট করছিস। অত টাকা দেয়, না হয় একটু

আবদার করলই—'

'আবদার! দ্যাখো মাসী, তুমি যদি ফের ওই বেয়াড়া আবদেরে মিনসেটার সঙ্গে আমাকে পাঠাও, তাহলে শেষ পর্যন্ত একটা খুনোখুনি কাণ্ড হয়ে যাবে বলে দিচ্ছি। অমন টাকায় আমি ঝাঁটা মারি। এমন নোংরা কাণ্ড করে—'

অন্য মেয়ে এতবড় কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলে তার কপালে অনেক লাঞ্ছনা, অনেক দুর্গতি লেখা থাকত। কিন্তু জবার বেলা মাসীর গলা একেবারে অন্যরকম। একেবারে নরম সুর। 'আহা অত রেগে যাচ্ছিস কেন বল তো মেয়েটা? বুড়ো মানুষরা ওইরকম একটু আধটু হুজ্জত করেই থাকে। তবে কত টাকা দেয় বল দিকিনি? টাকায় ঝাঁটা মারলে কি চলে বাছা? টাকাই লক্ষ্মী, সংসারের সারবস্তু। আজ যদি তোর অনেক টাকা থাকত, তাহলে কি তোকে অমন যার তার সঙ্গে—'

'আমার শরীরপাত করা টাকার অর্ধেকটা তো তোমার হাতেই যায় মাসী।' জবা মালতী সেনের মুখের ওপর যেন তীর ছুড়ে মারে। 'বলিহারী তোমার' টাকার লোভকে! জুঁইটার শরীর ভাল নয়, একথা জেনে শুনেও তুমি কেমন করে ওর ঘরে ওই গুণ্ডা বদমাইসটাকে ঢোকালে?'

'শরীর ভাল নয়! বারো মাসই ও ছুঁড়ীর শরীর খারাপ। মরে যাই মরে যাই কি আমার দরদী এলেন!' মালতী সেনের হাই ফ্যামিলির সংস্কৃতির ঐতিহ্যের মুখোশটার বিন্দুমাত্র আবরণও আর থাকে না। কিছুক্ষণ পূর্বের অমন নরম মিষ্টি গলায় যেন ভাঙা কাঁসর খন খন করে বেজে উঠল। গোলগাল ভারী মুখখানা বিকৃত করে তিনি যেন মুখরা জবার অবাধ্যতার শোধ তুলতে শুরু করলেন অত্যন্ত নিরীহ শান্ত অনুপস্থিত জুঁইয়ের ওপর।

'অমন ননীর শরীর রাজার বাড়িতেই মানায়। এখানে আমার মত গরীবের বাড়িতে মাসভোর শরীর খারাপ বলে বিছানায় শুয়ে পড়ে থাকলে আমার সংসার চলে না। এটা চিৎপুর কি বাগবাজারের গলি নয়। এটা আমার বাড়ি। সমাজে আমার নাম-ডাক আছে। 'আমার মেয়েরা' বলেই ওপরতলার হাই সোসাইটির বড় বড় মানুষগুলো তোদের নিয়ে হোটেলে পার্টিতে যায়। সিনেমা থিয়েটার দেখায়। আমি যাদের আনি

তারা দু'চার টাকার ফোতো বাবু নয়। আমি আমার বাড়িতে রেখেছি তাই। নইলে মজা টের পেত সব। গলির মোড়ে গিয়ে রূপ দেখিয়ে দুটো টাকার জন্যে বাবু ধরতে হত।'

'বার বার ওই একই কথা কেন আমাদের শোনাও বল তো মাসী?' জবা ক্রুদ্ধ আরক্ত মুখে জবাব দেয়, 'তুমি কি আমাদের দয়া করে অমনি রেখেছ? আমাদের দিয়ে অনেক টাকাই রোজগার করছ। আমাদের নাম করে চাঁদা তুলছ। সকলের কাছে মিথ্যে বলে বেড়াচ্ছ। একদিন সবাই টের পেয়ে যাবে তোমার সব কথা, আমাদের সব কথা, তখন মজাটা টের পাবে।'

'থাম ছুঁড়ী থাম। আমাকে আর মজা টের পাওয়াতে হবে না। নিজেদের আখেরের চিন্তা কর।'

মালতী রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন। সভ্যতা ভদ্রতা হাই সোসাইটিতে জন্ম, বিবাহ, গেলামেশা ইত্যাদি সমস্ত কথা ভুলে গিয়ে অশ্লীল ভঙ্গিতে হাত-মুখ নেড়ে চেঁচাতে থাকেন। 'বিষ নেই, কুলোপানা চক্কোর! মূলধন তো ওই একটাই। রূপ আর যৌবন। তাই ভাঙিয়ে তো খাচ্ছিস। যেখানে যাবি, ওই কম্মো করেই খেতে হবে। কেউ কোন চুলোয় অমনি জায়গা দেবে না। বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবেও না। আমি কাউকে পায়ে ধরে সেধে সেধে আনিনি, বেঁধেও রাখিনি। তোদের সব আলাদা আলাদা ফাইল আছে না? তাতে তোদের সব কেলেঙ্কারির বেত্তান্ত লেখা আছে না? বণ্ডে তোরা সই দিসনি? ফাইলে তোরা সই দিসনি? স্যাক্ষী-সাবুদ নেই? আমি অত ন্যাকা বোকা মেয়ে নই। এ লাইনে তোদের জন্মাবার আগে থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছি। লিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে তবেই না এখানে থাকতে দিয়েছি। জানাজানি হলেই বা আমার কি? সই করা কাগজপত্রগুলো সিন্দুক খুলে বার করব না সবার সমুখে? কী আমার সব সতীলক্ষ্মীর দল রে! হুঁঃ।'

জ্বলন্ত আগুনের মত দুম দুম করে পা ফেলে স্থানত্যাগ করেন মালতী সেন।

যা বলার বলেছেন। কাজ হাঁসিল হয়ে গেছে। জোঁকের মুখে নুন দেবার কায়দা-কানুনটা বেশ ভালভাবেই রপ্ত করা আছে তাঁর।

নইলে এ ব্যবসায় উন্নতি করতে পারতেন না। ইমামবাজারের গলির মোড়ে দাঁড়িয়েই জীবন কাটত। আঙুরবালা থেকে মালতী সেন হতে পারতেন না।

হ্যাঁ ইমামবাজারের বেশ্যা পাড়ার গলির মোড়ে সন্ধ্যে বেলা সেজে গুজে দাঁড়িয়ে থাকা সেই আঙুরবালা থেকে, আজকের এই মিসেস মালতী সেনে পৌঁছবার আগেও তাঁর একটা ছোট খাট অতি সাধারণ জীবন, ও তুচ্ছ ইতিহাস ছিল বইকি ?

মালতী সেনের মন থেকে কোনদিনও সে জীবন আর সেই ইতিহাস মুছে যাবে না।

কিন্তু মালতী সেন কোনদিনও সেই জীবনে ফিরে যেতে চাননি। ফিরে যাবেনও না। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে তিনি মুক্তি পেয়েছেন। অভাব অনটন আর দারিদ্র ছাড়া সেখানে আর কিছুই ছিল না।

অন্য যে কোন মেয়ে হলে বোধহয় সে সেই সংসারেই পড়ে থাকতো। স্বামীকে শাশুড়ীকে (তারা যেমনই হোক না কেন) শ্রদ্ধাভক্তি করে, উদয়াস্ত সংসারের খাটুনি খেটে, সেখানেই জীবন কাটাতো।

কিন্তু মালতী সেন সে জীবন চাননি। একদিনের জন্যেও না।

মালতী সেনের সেই সময়কার নাম ছিল শোভা দাস। একেবারে খাস কলকাতার না হলেও, সহরতলির বাসিন্দা শোভার বাবা সামান্য একটা চাকরি করতো। সংসারে বৌ ছাড়াও শোভার বাবার পাঁচটা ছেলে মেয়ে। প্রথম তিন মেয়ে। তারপর দুই ছেলে।

প্রথম দুটো মেয়েকে পার করতে শোভার বাবাকে হিমসিম খেতে হয়েছিল। অফিস থেকে লোন নিতে হয়েছিল। সংসারের অবস্থা চরমে উঠেছিল।

শোভা তখন স্কুলে পড়ে। কলকাতার হালচাল কিছুটা রপ্ত করতে শিখেছে। অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েদের সাজ-সজ্জা চলন বলন দেখে তেমন তেমনটি করার জন্যে মনের মধ্যে তাগিদ অনুভব করছে। নকল করতে চেষ্টা করছে।

তিন বোনের মধ্যে শোভাকেই দেখতে ভাল।

দুবেলা পেটভরে ভালমন্দ খেতে না পাক, এক বেলা ডালভাত জুটুক, তবুও স্বাস্থ্যটা ওর বরাবরই ভাল।

চেহারায় আলগা একটা চটক আছে। যা পুরুষকে আকর্ষণ করে। বার বার ফিরে তাকাতে বাধ্য করে। ও যখন স্কুলে যায়, বন্ধুদের বাড়ি বেড়াতে যায়, দোকান পাট করতে যায়, তখন রকে বসে থাকা অনেক মাস্তান ছোকরাই ওকে দেখে শীষ্ দিয়ে ওঠে। হিন্দি সিনেমার গানের কলি শোনায়।

কেউ কেউ ওকে ফলো করে। আভাসে ঈঙ্গিতে কেউ কেউ প্রেম নিবেদন করে। দু'চারখানা প্রেমপত্রও শোভা পায় বই কি!

এতে শোভা বিন্দুমাত্রও লজ্জা বোধ করে না।

ও জানে, এটা ওর প্রাপ্য। শুধু ওর কেন? সুশ্রী যৌবনবতী সব মেয়েরাই এটা পায়। প্রাকৃতিক নিয়মে। পুরুষের স্তবস্তুতি রূপের যৌবনের প্রশংসা যে মেয়ের কপালে জোটে না, তারমত পোড়া কপাল আর কার?

এই সব রকবাজ ছোঁড়াদের প্রশ্রয় দিতেও কিন্তু বাধতনা শোভার। বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করতনা। অভাবের সংসারে ইচ্ছে মত কিছুই ওর জুটতনা। না গয়না, না ভাল শাড়ি ব্লাউজ। না স্নো পাউডার এটা ওটা সেটা মেয়েলী জিনিষ।

অথচ সচ্ছল অবস্থার মেয়েদের সেই সব মূল্যবান জিনিষপত্র ব্যবহার করতে দেখে, শোভার দারুণ ইচ্ছে হত, সেই সব জিনিষ পাবার। ইচ্ছে হত, ওদের মত ও অমন স্টাইলে সেজে গুজে কলকাতার বড় বড় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। মেট্রো এলিট গ্লোবে সিনেমা দেখে। এখানে ওখানে বেড়াতে যায়। বড় বড় হোটেলে খায়। এই ইচ্ছেই, অপরিসীম উচ্চাকাঙ্ক্ষাই শেষ পর্যন্ত কাল হল শোভার।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, সর্বাঙ্গে যৌবনের ঢল নামার সঙ্গে সঙ্গে শোভা খুব সহজেই বুঝতে পারল, শুধু স্নো পাউডার আলতা লিপস্টিক, এটা

ওটা সেটা মেয়েলী জিনিষ, শাড়ি ব্লাউজই বা কেন, ইচ্ছে করলে আরো অনেক—অনেক কিছুই পাওয়া যায়।

ইচ্ছে মত মেট্রো গ্লোবে এলিটে গিয়ে দারুণ দারুণ ইংরিজি হিন্দি ছবি দেখা যায়। বড় বড় রেস্টুরেণ্টে হোটেলে গিয়ে ভালমন্দ খাবার খাওয়া যায়। ট্যাক্‌সি চেপে এখানে ওখানে বেড়ানো যায়। ইচ্ছে মত খরচ করবার জন্যে প্রচুর টাকা পাওয়াও যায়।

ওর ইচ্ছের সঙ্গে মিলে যায়, এমন একটি মেয়ের সঙ্গে হঠাৎ দারুণ ভাব হয়ে গেল শোভার। ঠিক তার এই উঠতি বয়সেই।

তার কাছ থেকেই ও প্রথম পাঠ নিল, গরীব হয়ে থাকাটা মহাপাপ। সামান্য কিছুর বিনিময়ে যদি অনেক কিছু পাওয়া যায়, ক্ষতি কী? বোকার মত দুঃখকষ্টে থেকে লাভ কি?

তার কাছ থেকেই শোভা ভাল ভাল হোটেলে খাওয়ার, ভাল ভাল শাড়ি ব্লাউজ কেনার, দামী দামী সিনেমা হলে ছবি দেখার, এখানে ওখানে ট্যাকসি চড়ে বেড়াবার বেশ মোটা টাকা রোজগার করার কলা-কৌশলটা বেশ ভাল করেই রপ্ত করে নিল। আনন্দের সঙ্গেই।

মেয়েটার নাম বীনা। বয়সে শোভার চেয়েও কয়েক বছরের বড়। মাথার ওপর বাবা নেই। সংসারটা প্রায় অচল বললেই চলে। অনেক দুঃখে কষ্টে পড়েই, একরকম বাধ্য হয়েই এ পথে নামতে হয়েছে।

বয়সে দু'চার বছরের বড় হলেও, বীনা অভিজ্ঞতায় আরো অনেক বেশী পাকাপোক্ত। ওর অনেক পুরুষ বন্ধু আছে। দেখতে ও বেশ সুশ্রী সুদর্শনা। কথাবার্তায় খুব চটপটে।

শোভা বীনার সঙ্গেই মেলামেশা ঘোরাফেরা করতে সুরু করলো। বীনার পুরুষ বন্ধুদের সংগে এখানে ওখানে যাওয়াও সুরু করলো।

কয়েক মাসের মধ্যে ওর চেহারায় সাজসজ্জায় বেশ পরিবর্তনও এলো। নিজের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা, উচ্চতর হতে লাগল।

পাড়ার মধ্যে উঠতি বয়সের মেয়েদের এসব 'রসের' ব্যাপার বেশীদিন চাপা থাকেনা। জানাজানি কানাকানি সুরু হল। শোভার বাবা মাও

যথা সময়ে মেয়ের কীর্তি কলাপ জানতে পেরে, ওর বিয়ে দেবার জন্যে প্রাণপন চেষ্টা করতে লাগল।

জুটেও গেল অল্প কিছুদিনের মধ্যে।

রঘুনাথ চাকী। সোনারপুর ইঁটখোলার ম্যানেজার। ত্রিশ বত্রিশ বছর বয়স। পাড়াগাঁয়ের মানুষ। সহজ সরল হাবা গোবা। দেখতেও এমন কিছু নয়। তবে স্বভাবটি বড় ভাল। মাথার ওপর বাবা নেই, মা আছে। ছোট ছোট দুটো ভাই বোনও আছে।

রঘুনাথের মাও খুব ভালমানুষ।

বিয়ের সম্বন্ধ হবার পর রঘুনাথ মাকে সঙ্গে নিয়ে সোনারপুর থেকে কলকাতায় মেয়ে দেখতে এসেছিলেন। আর মেয়ে দেখে দারুণ পছন্দ করে পাকা কথা দিয়েই এসেছিল। দাবীদাওয়া কিছুই ছিলনা ওদের।

ষোলো বছর বয়সের শোভার কিন্তু মোটেই রঘুনাথকে পছন্দ হয়নি। দেখতে ভাল নয়, তেমন লেখাপড়া জানে না, ভাল চাকরি করেনা, গেঁইয়া। সহুরে বাবুদের মত জামাকাপড় পরতেও জানেনা। চাল-চলনে, কথাবার্তাতেও একেবারে গেঁয়ো ভূত। সহরেও বাস করেনা। বয়সেও অনেক বড়।

শোভা অমন পাত্রকে বিয়ে করবেনা বলে প্রচণ্ড আপত্তি জানিয়েছিল। মায়ের কাছে খুব কান্নাকাটিও করেছিল।

কিন্তু ওর আপত্তিতে কেউ কান দেয়নি।

গরীব ঘরের মেয়ের এমন উদ্ভট আবদার কোন্ বাপ-মাই বা শোনে?

কী এমন খারাপ পাত্র বাপু?

কিছু দেওয়া থোওয়া করতে হবে না। এটা কি বড় কম কথা? তাছাড়া মা, ছেলে দু'জনেই খুব ভালমানুষ। ওদের অবস্থাও একেবারে খারাপ নয়। বাড়িটা পাকা না হলেও, বেশ খানিকটা ধানজমি আছে। পুকুর আছে। ছেলে যাহোক একটা চাকরিও তো করে।

অমন পাত্র পছন্দ নয় মেয়ের। কেন বাপু? তুই কী এমন সুন্দরী? রাজার ঝি?

গলার কাঁটা হয়ে তো বসে আছিস! স্বভাবটাও তো ক্রমশ মন্দের দিকে। পার করতে পারলে বাঁচা যায়।

সুতরাং শোভার বিয়ে হয়ে গেল ওই রঘুনাথ চাকীর সঙ্গেই। ঘর বর পছন্দ না হলেও, ইচ্ছার বিরুদ্ধে শোভাকে কলকাতা সহরের মায়া ত্যাগ করে, সেই ধ্যাড়ধেড়ে গ্রাম, সোনারপুরেই চলে যেতে হল।

কিন্তু শ্বশুরবাড়ি পা দেবার পর থেকেই শোভার মন একেবারে বিদ্রোহী হয়ে উঠল। কলকাতা সহরের মানুষদের সঙ্গে এদের কোথাও মিল নেই। দিনরাত কাজ আর কাজ। অভাব অনটনের সংসারে শাশুড়ীর সঙ্গে সঙ্গে ওকে রান্না করতে হয়। মশলা পেষা, সাবান কাচা উঠোন নিকানো ঘর দোর ঝাড়া লেপা পোঁছা, সবই করতে হয়।

স্বামীটারও যেমন ছিরিছাঁদ! তেমনই আচার ব্যবহার!

তাকেও দু'চোখে দেখতে পারল না শোভা। একেবারে গ্রাম্য! উপরন্তু রঘুনাথ শোভাকে পেয়ে আনন্দে যতটা আত্মহারা বিগলিত বিচলিত হয়ে উঠ্‌ছিল, ও ততটাই বিরক্ত অসন্তুষ্ট ও অতৃপ্ত হয়ে উঠতে লাগল।

শাশুড়ী দেওর ননদ স্বামী, কাউকেই শোভার ভাল লাগে না। কাজ কর্ম করতে বিন্দুমাত্রও ইচ্ছে করে না। রাত্রে স্বামীর পাশে শুতেও তার প্রবল অনিচ্ছা।

কী করে যে এখানে মানুষ থাকে?

ইলেকট্রিকের আলো নেই। জলের কল নেই। সিনেমা হল নেই। রাস্তাঘাটগুলো যেন জঙ্গল হয়ে আছে। তেমন তেমন মানুষ জনও নেই। শোভার মত আপটুডেট স্মার্ট সহুরে মেয়ের সঙ্গে মেশবার মতন তেমন মেয়ে বৌও নেই এখানে।

কী বিচ্ছিরী জায়গা রে বাবা!

সন্ধ্যে হতে না হতেই শোভার পাগল হবার মত অবস্থা হতে থাকে। শেয়াল ডাকে। চারিদিকে গাছপালা মাঠ ঘাটের ওপর এক শ্বাসরোধকারী নিস্তব্ধতা নেমে আসে। জোনাক জ্বলে। গ্রামের মানুষগুলো সকাল বেলাকার রান্না ভাত তরকারী খেয়ে অন্ধকার ঘন হবার আগেই দোরে খিল দেয়। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে।

সবচেয়ে দুঃসহ, বাথরুম নেই। বাড়িতে জলের কোন ব্যবস্থাই নেই। পুকুরঘাটে গিয়ে স্নান করতে হয়। সাবান কাচতে বাসন মাজতে হয়। আরো অনেক কিছু করতে হয়, শোভা কলকাতার মেয়ে বলে যা শোভা

জীবনেও করেনি।

অসন্তোষ ক্রমাগত বেড়েই চললো। কিছুদিন কোনক্রমে কাটিয়ে বাপের বাড়ি চলে এলো।

—এসেই বীনার সঙ্গে দেখা করে কান্নায় ভেঙে পড়লো। সব কিছু খুলে বললো তাকে। এ জীবন তার অসহ্য হয়ে উঠেছে।

পুরোনো বয়ফ্রেণ্ডদের সঙ্গে আবার দেখা হল। শোভা বুঝতে পারলো, এভাবে চলতে ও পারবে না। যাহোক একটা কিছু তাকে করতে হবে। এই দুই জীবনের মধ্যে একটা জীবন ওকে বেছে নিতেই হবে।

সেই মনের মত, পছন্দমত জীবনই ও বেছে নিল।

বিয়ের পর মাস তিনেক কাটতে না কাটতেই শোভা উধাও হয়ে গেল। বীনাই আলাপ করিয়ে দিয়েছিল সেই মক্কেল বাবুটির সংগে। পয়সাকড়ি যতটা আছে, মেয়ে মানুষের ওপর লোভ লালসা আছে তার চতুর্গুণ। শোভার রূপ যৌবনের মূল্যায়ন করতে তারও দেরী হয়নি। শোভা কী চায়, সেকথা জানতেও তার বাকি ছিল না। সুতরাং……

সেই যে শোভা ঘর ছাড়লো, আর ফিরে এলো না। সে যা চেয়েছিল (পুরোপুরি না হলেও) তাই পেল।

তবে এ লাইনে এলে যা হয়. বেশ কয়েকবার হাত বদল হল। বেশ কতকগুলো মক্কেল বাবুকে ধরলো, ছাড়লো।

সেই সংগে অভিজ্ঞতাও হল প্রচুর।

'শোভা' নামটা পালিয়ে যাবার পর থেকেই জীবন থেকে মুছে ফেলেছিল। একজন পিরীতের বাবু আদর করে তার নাম দিয়েছিল আঙ্গুরলতা।

তারপর সেই বাবুটিও ইমামবাজারের গলির মধ্যে এক বাড়িউলির হেফাজতে শোভাকে ফেলে রেখে, অন্য কোন ডালিম বেদানার সন্ধানে উধাও হয়ে গেল।

সেই গলির মধ্যে বাস করতে করতে, সেজে গুজে ভরসন্ধ্যে বেলায়

গলির মোড়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে, শরীর দেখিয়ে চোখের ইসারায় খদ্দের ধরতে ধরতেও আঙ্গুর স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের।

না, সুস্থ সুন্দর স্বাভাবিক জীবনের স্বপ্ন নয়।

এই আদিম ব্যবসারই রূপান্তরিত আর এক জীবনের স্বপ্ন। সমাজে হাই সোসাইটিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার স্বপ্ন। আরো—আরো টাকা রোজগারের স্বপ্ন। বড় বড় মানুষদের, লাখপতি কোটিপতি মানুষদের সংগে মেলামেশা দহরম-মহরম করার স্বপ্ন।

এই বেশ্যাপাড়ার গলির মোড়ে রোজ সন্ধ্যে বেলায় দাঁড়িয়ে খদ্দের ধরার মধ্যে কোন সুখ নেই। সম্মান নেই।

শুধুই পরিশ্রম মাত্র। দেহপাত করা।

কিন্তু দেহই যাদের মূলধন, সেই দেহ পাত হলে কী থাকবে? সর্বনাশের অতলে তলিয়ে যেতে হবেনা একদিন?

আঙ্গুর কি চোখের ওপরেই এমন অনেক জনের সর্বনাশ দেখেনি? দেখতে পাচ্ছে না?

রূপ-যৌবন স্বাস্থ্য হারিয়ে তাদের কি হালই না হয়েছে? কালী মন্দিরের চত্বরে বসে ভিক্ষে করছে প্রভারেণু শুভারা। লোকের বাড়ি ঝি বৃত্তি করছে মানদা পুনি রানী জ্যোৎস্নারা। খারাপ রোগে ভুগছে সুখী রেনুকা বিমলারা।

এতদিনের শরীর বেচা টাকার কিছু অবশিষ্টও আর তাদের নেই! কী কষ্টের জীবনই না যাপন করছে আজ ওরা। একে কি বেঁচে থাকা বলে?

ওদের দেখে আঙ্গুর আবার একটা কঠিন প্রতিজ্ঞা করেছিল, মনে মনেই অবশ্য।

এভাবে নয়। এমনভাবে ইমামবাজারের গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে সারাজীবন কাটাবেনা আঙ্গুর।

তাকে আরো ওপরে উঠতে হবে।

তাকে অন্য কোনখানে যেতে হবে। আরো-আরো টাকা রোজগার করতে হবে। এটা তার আসল জায়গা নয়। এখানে ও যা রোজগার করে, তার অর্ধেকই চলে যায় বাড়িউলি মাসির গ্রাসে।

তার কয়েক বছর পর আঙ্গুরের বয়স যখন আরো খানিকটা বেড়ে গেল, তখন তার স্বপ্নও সফল হবার মুখে। অনেক মক্কেল মক্কেল বাবুদের সংগে তখন তার আলাপ হয়ে গেছে।

আঙ্গুরলতা তখন আরো চালাক চতুর চটপটে হয়েছে। আসল নকল চিনতে শিখেছে। কোন বাবুর কত টাকা আছে, কোনটা ফোতো বাবু, বুঝতে শিখেছে। আর একটা সার কথাও বুঝতে পেরেছে, এখানে, এইভাবে গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে, বাবু ধরে জীবন কাটালে, একদিন তারও ওই রানীবালা, সুখী, প্রভারেণু, জ্যোৎস্না ওদের মতই দশা হবে।

ওদের মতই দোরে দোরে ঝি বৃত্তি করতে হবে।

অথবা কুৎসিত রোগগ্রস্ত হয়ে ভুগে ভুগে গলে পচে মরতে হবে। শেষ সময়ে মুখে জল দেবার লোকও জুটবে না—

আর তাও যদি না হয়, মন্দিরের দরজায়, অথবা রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে চেয়ে বেড়াতে হবে।

একই গলির বাসিন্দা, একই লাইনের সহকর্মিনী, একই পথের পথিক, দেহ ব্যবসায়িনী প্রভা রেণুবালা সুখী জ্যোৎস্নাদের দৈন্যদশা আর দুরবস্থা চোখের ওপর দেখে দেখে আঙ্গুর নিজের ভবিষ্যত সম্বন্ধে বড় বেশী ভাবতে শুরু করলো।

বাবুদের 'ধরাধরি' নিয়েও বেশ সতর্ক ও সচেতন হয়ে উঠল।

যতই ও এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে লাগল, ততই যেন ও আরো ওপরে ওঠার জন্যে, আরো অনেক টাকা রোজগার করার জন্যে, স্বাধীনভাবে থাকার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠতে লাগল।

কথায় বলে, ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়।

সব মানুষের বেলায় এই প্রবাদ বচনটি না ফললেও, অত্যন্ত আত্ম-সচেতন কেরীয়ারিষ্ট আঙ্গুরের বেলায় কিন্তু বেশ খেটে গেল।

গ্রহ নক্ষত্রের চক্রান্তে আঙ্গুরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল কিষনলাল বাজা-রিয়ার সংগে।

অনেক টাকার মালিক। অনেকগুলো ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। একটা নারী কল্যাণ আশ্রম (বেসরকারি) ও আর একটা সরকারি গার্লস্ হোমের সেক্রেটারী। মোটা ডোনেশান দাতা।

আশ্রয়হীনা অসহায়, দুস্থ, অনাথ বিধবা ও সমাজচ্যুত মেয়েদের জন্যে এই বেসরকারি আশ্রমটির দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা এই কিষণলাল বাজা-রিয়াকে যতরকম সম্ভব (একজন বাজারের স্ত্রীলোকের পক্ষে) সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত করে আঙ্গুর তার কৃপালাভ করে ধন্য হ'য়ে একদিন তারই হাত ধরে ইমামবাজারের সংকীর্ণ গলি থেকে বার হয়ে একেবারে সোজা তারই প্রতিষ্ঠান, সেই নারীকল্যাণ আশ্রমে ঢুকে পড়লো।

এখানকার দুঃস্থ অনাথ মেয়েদের কিছুটা লেখাপড়া শিখিয়ে, এটা সেটা হাতের কাজ বোনা সেলাই ফোঁড়াই ইত্যাদি নানারকম কাজ শিখিয়ে তাদের স্বাবলম্বী ও ভদ্র জীবন যাপনের উপযুক্ত করে তোলাই এই প্রতিষ্ঠানের কাজ। (অন্তত বাইরের লোকেদের কাছে সেইভাবেই প্রচারিত ও বিজ্ঞাপিত ছিল।)

কিষণলাল বাজারিয়ার কৃপায় আঙ্গুর নিজের আসল পরিচয় লুকিয়ে এখানে চতুর্থ শ্রেণীর মহিলাকর্মী হিসেবে এই সব মেয়েদের তদ্বির তদা-রকির ও পাহারাদারের চাকরিতে নিযুক্ত হল।

কিন্তু একাজেও খুব বেশীদিন টিকে থাকতে পারল না আঙ্গুর। বছর খানেক কাটতে না কাটতেই এক বিশ্রী ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ল। নারীকল্যাণ আশ্রমের দু'তিনজন হর্তাকর্তা ব্যক্তিদের সংগে (এদের মধ্যে কিষণলাল বাজারিয়াও একজন, বলাই বাহুল্য) কয়েকটি সুশ্রী অল্প বয়সী মেয়েদের নিয়ে দালালি করার-অভিযোগে অভিযুক্ত হল আঙ্গুর।

এই 'কেলেঙ্কারি'র তদন্ত অবশ্য ধামাচাপা পড়ে গেল। তবে ওখানকার চাকরি খতম হয়ে গেল আঙ্গুরের। একেবারে নিখোঁজ হয়ে গেল সে ওখান থেকে।

তারপর, মাত্র বছর দুয়েক পরেই আঙ্গুরের খোলস ছেড়ে, সমাজ সেবিকার কল্যাণময়ী ভূমিকায়, নতুন নামে মালতী সেন আত্মপ্রকাশ করলেন।

সাজ-সজ্জায়, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে হাই সোসাইটির সুস্পষ্ট

ছাপ। সমাজের উচ্চপদস্থ, ধনী মানুষদের সংগে মেলামেশায় যাঁর অদ্ভুত কৃতিত্ব।

বেশ বড় বড় ভাল ভাল কথা কইতে, লেকচার দিতে শিখে গেছেন। সেই কথাবার্তা আর লেকচারের মধ্যে বেশ কয়েকটা ইংরিজি বুকনি ঝাড়াও রপ্ত করেছেন ততদিনে।

তাঁকে দেখলে, তাঁর সংগে কথা বললে বেশ সমীহ করতে ইচ্ছে হয় সকলের। বিশেষ করে মহিলাদের।

একটা নির্জন নিরিবিলি পাড়ায় মস্ত বড় একটা দোতলা বাড়ি নিয়ে কেতা দুরস্ত ভাবে বাস করছেন উনি। বাড়ির সদর দরজায় 'মালতী নিবাস' লেখা নেমপ্লেটও করে রেখেছেন।

আর একটা সমাজ হিতকর কাজও করেছেন।

সমাজচ্যুত অসহায় কয়েকটি মেয়েকে সেখানে আশ্রয় দিয়েছেন। তাদের মায়ের মত আগলে রেখেছেন। দেখাশোনা করছেন।

কোনকূলে কেউ নেই, এই সব নষ্ট ভ্রষ্ট মেয়েদের জন্যে এমনটি কে করে?

মালতী সেনের সেই পাতাকাটা রং মাখা শরীর বার করা 'আঙ্গুর আঙ্গুর' চেহারাটিও একেবারে অন্য রকম হয়ে গেছে।

গায়ে আরো মেদ লেগেছে। রং ফর্সা হয়েছে। পোষাক পরিচ্ছদেও পরিবর্তন এসেছে।

হালকা রংয়ের দামী সিফন নাইলনের সংগে ম্যাচ করা ব্লাউজ। পায়ে এক ইঞ্চি হীল জুতো। হাতে ঝকঝকে ব্যাগ। মণিবন্ধে রিষ্ট-ওয়াচ। হাতে কানে গলায় সামান্য কিছু শোভন সোনার গয়না। চোখে সোনালী জার্মান ফ্রেমের চশমা।

সব মিলিয়ে যেন একটা অ্যারিস্টক্র্যাট লেডী লেডী ভাব।

শোবার ঘরে দরজা বন্ধ করে, মস্ত বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মালতী সেন তাঁর এই রূপান্তরিত চেহারা দেখে দারুণ মোহিত হয়ে যান। সুসজ্জিত ঘরের গদরেজের আলমারি খুলে কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে রাখা থাক থাক নোটগুলোর গায়ে হাত বুলিয়ে তাঁর চোখ মুখের চেহারাই পালটে যায়।

বিশ্বসংসার বিস্মৃত হয়ে মালতী সেন হাজার বার গোণা সেই নোটের তাড়াগুলো আবার গুণতে শুরু করেন।

মালতী সেন কখনো অতীতের দিকে পেছন ফিরে তাকান না। রঘুনাথ চাকীর বৌ শোভারানী চাকীকে চিনতেও চান না। আর ইমাম-বাজারের গলির মোড়ে সন্ধ্যেবেলা সেজে গুজে দাঁড়ানো সেই আংগুর-কেও তিনি মন থেকে নিঃশেষে মুছে ফেলতে চান।

মালতী সেন শুধুই মালতী সেন হয়ে বাদবাকি জীবন কাটাতে চান!

তিনি ছাড়া তাঁর এই নতুন জীবনে আর যারা থাকবে, তারা জবা হেনা পারুল যূথি টগর চামেলী মল্লিকা নামে ক'টি সুন্দর সুগন্ধ ফুল। তাঁর টাকা রোজগারের মেসিন।

এই সাতটা ফুল থেকে একটা ফুলও যদি ঝরে যায়, তাহলে নতুন কোন সুন্দর শোভাময় ফুল, যেখান থেকেই হোকনা কেন, ছিঁড়ে উপড়ে এনে মালতী সেন তার শূন্য স্থান পূর্ণ করবেন।

মালতী সেন হার মানবেন না। কখনো না।

খাওয়া-দাওয়ার পর থেকে সারাটা দিন মেয়েদের অখণ্ড বিশ্রাম।

ঘুমোও জিরোও। গল্প কর। কেউ বাধা দেবে না। এখন তোমরা স্বাধীন। স্বতন্ত্র। গত রাত্রের শারীরিক ক্ষয়ক্ষতি পরিশ্রমের ক্লান্তি দূর করে প্রস্তুত হও আগামী রাত্রির নৈশলীলার জন্যে।

জবা তার নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে ছিল।

সবচেয়ে কম বয়সের সবচেয়ে ধীর শান্ত বাধ্য যূথি, সবাই যাকে জুঁই বলে ডাকে, চুপি চুপি জবার ঘরে ঢুকল। তাকিয়ে দেখল, ওর চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে মল্লিকা হেনা পারুলরাও যে যার ঘর ছেড়ে জমিয়ে বসে আছে। শুয়ে আছে। আধশোয়া হয়ে আছে।

জুঁই শুধু অল্পবয়সীই নয়। এখানে ও নতুন এসেছে।

সর্বদা বিষণ্ণ বিমর্ষ হয়ে থাকে। ওর বড় বড় চোখ দুটো যেন সর্বদাই জল ছলছল করছে। ওকে দেখলেই বোঝা যায়, এই অপ্রত্যাশিত অকল্পনীয় জীবনধারার সঙ্গে ও এখনো মানিয়ে চলতে পারছে না।

'আয়, এখানে বোস।' জবা ওকে দেখে একটু সরে শুয়ে ওকে বসবার মত জায়গা করে দিল।

মল্লিকা জিজ্ঞাসা করল, 'ঘুমোসনি যে বড়? মাসী টের পেলে বকবে।'

জুঁইয়ের ঠোঁট কাঁপল, 'ঘুম আসছে না। মাসী ওপরে ওঠবার আগেই আমি আমার ঘরে পালিয়ে যাব।'

'একটু একটু করে ক্রমশঃ চালাক হচ্ছিস তাহলে?' হেনা একটু হাসল।

জুঁই জবার হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'তোমার কী সাহস জবাদি? তুমি মাসীর সঙ্গে অমন করে ঝগড়া কর? মুখে মুখে তক্কো কর? মাসীকে তুমি একটুও ভয় কর না। আমার কিন্তু ওকে দেখলেই বুক ধড়ফড় করে। ভীষণ ভয় করে।'

'তুই ভয় করিস বলে আমি ভয় করব কেন? চুপচাপ মুখ বন্ধ করে সহ্য করে গেলে মাসী একেবারে আমাদের পেয়ে বসবে যে! তুই নতুন এসেছিস। আমি অনেকদিন আছি। তবে মাসী মুখে যত চেঁচাক, মা মারা যাবার পর থেকে আমাকে ও ভালই বাসে। আমরা ছাড়া তিনকুলে মাসীরই বা আর কে আছে বল? ওর শেষ সময়ে আমরা ছাড়া আর কে দেখবে? একথা মাসী ভাল করে জানে।'

মালতী সেন যে জবাকে বেশ একটু ভালবাসে, একথা ওরা সকলেই ভাল করে জানে বলে প্রতিবাদ করল না। তার প্রতি মাসীর ভালবাসা ও দুর্বলতার সুযোগ জবা প্রায়ই নিয়ে থাকে। অনেক জুলুমের হাত থেকে মেয়েদের জবাই বাঁচায়। মেয়েরাও তাই জবাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধাও করে। জবাই তাদের প্রতিনিধি। অভয়দাত্রী। রক্ষাকর্ত্রী।

জুঁই জবার হাতের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে ওর বালিশে ছড়ানো একরাশ কালো চুলের পটভূমিকায় সুগঠিত শরীরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি কি সুন্দর জবাদি। আমি যদি তোমার মত হতাম।'

'ও বাব্বা, এ মেয়ে বলে কি?' জবার হয়ে পারুল রঙ্গভরে জুঁইয়ের গাল টিপে টিপ্পনি কাটল, 'তুই নিজে কি কিছু কম সুন্দর নাকি? ওই চেহারার ঠেলাতেই তো অস্থির হয়ে যাচ্ছিস। জবার মত সুন্দরী হলে তোর কী দশা হত, ভেবেছিস? এক রাত্রে একটা পুরুষের ধকল সইতেই

কান্নাকাটি শুরু করিস। ওর মত সুন্দর হলে আরো ক'টাকে সামলাতে হত। পারতিস? দেখতে পাস না, ওকে পাবার জন্যে প্রত্যেক দিন ক'জন লোক মাসীর কাছে ধন্না দেয়?

এক মুহূর্তে জুঁইয়ের মুখখানা ঝলসানো ফুলের মত শুকিয়ে গেল।

তার এই নতুন জীবনের অতি তিক্ত অতি কুশ্রী কুৎসিত অভিজ্ঞতার স্মৃতি ওর সমস্ত মনটাকে কিছুক্ষণের জন্যে বিকল করে দিল। এক একজন অসুস্থ পুরুষের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও সম্ভোগের আগুনে ওর শরীরটা যেন জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ওরা জুঁইয়ের সকরুণ মিনতি আপত্তি কোন কিছুতেই কর্ণপাত করে না।

টাকা দিয়ে কেনা কয়েক ঘণ্টা অথবা দু' এক ঘণ্টার ক্রীতদাসীর দেহটাকে দলে পিষে একাকার না করলে ওদের সুখ হয় না। তৃপ্তি হয় না। কামনা পূর্ণ হয় না।

চামেলী এতক্ষণ চুপ করে ওদের কথা শুনছিল, নড়ে চড়ে, একটু কুণ্ঠার, লজ্জার সঙ্গে জবাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা ভাই জবা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?'

'একটা কেন, তোর যতগুলো ইচ্ছে ততগুলো কর।' শুয়ে শুয়েই জবা অলস ভঙ্গিতে তার কারুকার্যময় শরীরে তরঙ্গ তুলে মধুর হাসল।

'আমরা যখন এখানে মাসীর কাছে থাকতে আসি, তখন মাসী বলেছিল, আমাদের ভাল হবার সুযোগ দেবে। আমরা যাতে সৎপথে থাকি, পবিত্র হয়ে থাকি, কোন পাপ কাজ না করি তার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। আমাদের রক্ষক হয়ে থাকবে। আমাদের লেখাপড়া শেখাবে। দেখে-শুনে তেমন তেমন পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেবে—'

'বিয়ে দেবে! কোন পাপ কাজ যাতে না করি, দেখবে!' সমস্ত শরীর সাগরের ঢেউ তুলে খিল খিল করে প্রচণ্ড হাসির বন্যায় ভেঙে পড়ল জবা।

হাসির দমকে চোখের কোণে বেরিয়ে আসা জল মুছে একটু শান্ত হয়ে ও মুখ ভ্যাংচালো, 'চামেলী, তুই একেবারে গেঁইয়া বুদ্ধুই রয়ে গেছিস! বিয়ে তো তোদের রোজই হচ্ছে। নতুন করে আবার হবে কি? মাসীর বিয়ে দেওয়া মানেই এই। নিত্য নতুন বরের সঙ্গে রাত কাটাও,

ফুলশয্যে কর। বদলে টাকা নাও। প্রেম ভালবাসা ঘর সংসার স্বামী ছেলেপুলে, ওসবের নামও উচ্চারণ কোর না। মাসীর দায় পড়েছে আমাদের ভাবনা ভাবতে।'

জবার পাশে কাত হয়ে টগর শুয়েছিল।

উদাস ভাবে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, 'সত্যি ভাই চামেলী, জীবনে ঘেন্না ধরে গেল। এক একদিন মাসী এমন এক একটা মানুষ জুটিয়ে আনে যে ইচ্ছে করে এখান থেকে পালিয়ে যাই। কাল একটা পাঞ্জাবীকে আমার ঘরে পাঠিয়েছিল। দরজায় খিল দিতে না দিতে এমন বিচ্ছিরি হ্যাংলামি শুরু করল যে বলবার কথা নয়। মিনসেটা যেন সাতজন্মেও মেয়েমানুষ দেখেনি। যতক্ষণ ছিল, জ্বালিয়ে খেয়েছে। মাসীকে বলে গেছে আমাকে নাকি ওর ভীষণ পছন্দ হয়েছে। আজ আবার আসবে। কে জানে, কতদিন জ্বালাবে।'

জবার মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। ক্ষুব্ধভাবে বলে ওঠে, 'তোদের কাছে তবু একটা মানুষই ভাল লাগলে ঘুরে ফিরে আসে। আর আমার বেলা? মাসী নিত্যি নতুন মানুষ এনে হাজির করবে। কলগার্লের মত বাইরে পাঠাবে ওদের সঙ্গে। একটু নজর ধরা ভালমানুষ যদি আমার সঙ্গে দু'তিন দিন ঘুরে বেড়াল, অমনি মাসী কায়দা করে তাকে ভাগিয়ে আবার নতুন মক্কেল এনে হাজির করে। মাসী কেন অমন করে তা কি আর আমি বুঝি না? মাসী চায় না কেউ আমার সঙ্গে দুমাস ছমাস থাকুক। মাসীর ভয়, পাছে কেউ আমাকে সত্যি সত্যি ভালবেসে ফেলে। পাচ্ছে সে আমাকে বিয়ে করতে চায়, আমিও তাকে বিয়ে করে ফেলি। সব বুঝি আমি।'

হেনা মুখ টিপে হাসল, 'তা ভয় একটু হয় বইকি ভাই জবা। তুমি হচ্ছ মাসীর সোনার ডিম পাড়া হাঁস। হাঁসটি কারু সঙ্গে উড়ে পালিয়ে গেলেই মাসীর সর্বনাশ! মালতি-নিবাস জবা বিহনে অন্ধকার হয়ে যাবে। মাসীর সাজানো ফুলের বাগান শুকিয়ে যাবে। মাসীর ব্যবসায় গণেশ উলটোবে।'

জবা অন্যমনস্কের মত উত্তর দিল, 'যাই বলিস, আমার কিন্তু নিত্যি নতুন বাবু একেবারেই ভাল লাগে না। মায়ের কথা মনে পড়ে। মা মাসীকে বার বার বলে গিয়েছিল। মা আমাকে বার বার একই কথা বলে

এসেছেন। আমি যেন একজনকে নিয়েই ঘর বাঁধি। তাকে নিয়েই সুখে দুঃখে দিন কাটাই। একেবারে যেন একটা বেশ্যা হয়ে না যাই।

'এতদিন এ লাইনে থেকে নিত্যনতুন মানুষের সঙ্গে কাজ কারবার করে এখন তুই বিয়ে করে সতীলক্ষ্মী হয়ে চিরটা কাল একজনের সেবা করতে পারবি? ঘর করতে পারবি?'

'কেন পারব না?'

জবা উত্তেজিত ভাবে বিছানার ওপর উঠে বসল। 'অনেক মেয়েই এ লাইন ছেড়ে দিয়ে বিয়ে করে ঘর সংসার করছে। মাধবী রত্না বাসবী বেদানা কমলি ওরা তাদের যে-যার পিরিতের বাবুটিকে নিয়েই সংসার পেতেছে। অন্য বাবু আর ঘরে ঢোকায় না। তবু তো ওরা গলিতে দাঁড়ানো পুরুষ-ধরা বাজারের মেয়েমানুষ। ওদের তুলনায় আমরা অনেক উঁচু দরের মেয়ে। রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে অনেক ভদ্রঘরের মেয়েদের চেয়েও আমরা বেশী ভাল। মাসীর নিন্দে যতই করি না কেন, এক হিসেবে মাসী আমাদের খুব ভাল ভাবেই রেখেছে। সমাজের ওপরতলার বাবুদের বড় বড় অফিসার এঞ্জিনিয়ার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে নিজে যোগাযোগ করে মাসী আমাদের জন্যে বড় বড় 'মক্কেলবাবু' নিয়ে আসে। দু-পাঁচ টাকায় পাওয়া যায় এমন মেয়ে আমরা নই। আমাদের খুব একটা টাকার অভাব নেই। ঝি-চাকর আছে। খাওয়া পরার কষ্ট নেই। সাজানো গোছানো সুন্দর নিজস্ব একখানা করে ঘরও আছে। মনের মত ভালবাসার মত মানুষ জুটলে আমরা সকলেই বিয়ে করে আমাদের মা-ঠাকুমাদের মতই লক্ষ্মীটি হয়ে ঘর-সংসার করতে পারব। তোদের মনের ইচ্ছের কথা তোরাই জানিস, কিন্তু তোদের সবাইকে ছুঁয়ে আমি আমার মনের কথা বলছি। কোন ভদ্রলোক যদি সব জেনে-শুনেও আমাকে ভালবেসে বিয়ে করে এখান থেকে নিয়ে যায়, সে যদি গরীবস্য গরীবও হয়, তবু আমি যতদিন বাঁচব ততদিন তার দাসী হয়ে তার ঘর-সংসার করব।'

'মাসী পাকা কাজ করে রেখেছে।' টগর উত্তেজিত জবাকে আবার তার পাশে টেনে শুইয়ে বিমর্ষভাবে বলল, 'আমরা নাবালিকা নই। ইচ্ছে করে আমরা এখানে এসেছি, এই বৃত্তি গ্রহণ করেছি। আমাদের প্রত্যেকের

চরিত্রের স্খলনের পতনের জন্যে আমরা সমাজ-পরিত্যক্তা—এই সব বড় বড় শক্ত শক্ত ভাষায় কী সব লিখে টিখে এনে আমাদের সই করিয়ে রেখেছে। ফাইল করে সেই সমস্ত কাগজপত্র বন্ধ করে রেখেছে গডরেজের মধ্যে। কত কায়দাই জানে। আমরা কোথা থেকে কেমন করে এখানে এসেছি, প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি লেখা আছে কাগজে-কলমে। কেউ যদি ও সমস্ত লেখা পড়ে, তবে কোনদিনও আমাদের বিয়ে করতে চাইবে না, নষ্ট-খারাপ মেয়েমানুষ বলে।

'বিয়ের শখ ভাই আমার মিটেছে। তবে কেউ যদি বাঁধা রাখত, বেঁচে যেতাম। একজনের সঙ্গেই থাকতাম।'

এলোচুলের গুচ্ছ আঙুলে জড়াতে জড়াতে মল্লিকা একটু ফিকে হাসল। ওর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা বড় তিক্ত। বিয়ে তার হয়েছিল। সে বেশ কয়েক বছর আগের কথা। স্বামীটিও মনের মত হয়েছিল। শ্বশুর, শাশুড়ী, দেওর, ননদ নিয়ে মস্ত সংসারও তার ছিল। কিন্তু কপালে টেকসই হল না।

বিয়ের আগে বাড়িতে একজন পিসতুতো দাদা আসত। ওকে পড়াত। বেড়াতে নিয়ে যেত। খুবই ভালবাসত মল্লিকাকে।

তারপর হঠাৎ একদিন দুর্ঘটনা ঘটল।

যেমন করে পৃথিবীর সব দুর্ঘটনাগুলো ঘটে থাকে। সাবধান হবার কোন সুযোগ না দিয়ে মল্লিকার জীবন নিয়ে একটা কুৎসিৎ বিদ্রূপ করে, তার মানসম্মান সুখসৌভাগ্যের মুখে কালি মাখিয়ে তাকে একেবারে পথে বসিয়ে রেখে গেল।

তখন বয়স অল্প ছিল। পিসতুতো দাদাটি কোন এক নার্সিং-হোমে ওকে ভর্তি করে দিয়ে একেবারে দেশ ছেড়ে উধাও হয়ে চলে গেল।

'মর মর, তুই গলায় দড়ি দিয়ে আগুনে পুড়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে জলে ডুবে মর'—ওর বাবা-মা দিনরাত অষ্টপ্রহর ওকে এই অভিশাপ দিয়েও শেষ পর্যন্ত পেটের কাঁটা মুক্ত করিয়ে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। বছর দুই বাদে অনেক দূর দেশে সম্বন্ধ করে মল্লিকার বিয়েও দিয়েছিলেন অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে। মল্লিকার রূপ ছিল বলে সেটা সম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। দুর্ঘটনার, কেলেঙ্কারীর খবরটা ওর শ্বশুরবাড়ি

জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। তারা মল্লিকাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে ছেলের আবার বিয়ে দেন।

মল্লিকা অবশ্য তার দুর্ভাগ্যকে তার কর্মফল বলেই মেনে নিয়ে মরমে মরে বাপের বাড়িতে পড়ে ছিল।

ভেবেছিল, তার এই কালামুখ জীবনেও আর কাউকে দেখাবে না। কোন পুরুষকে বিশ্বাস করবে না।

কিন্তু যৌবন বড় বিশ্বাসঘাতক। যৌবনজ্বালা বড় জ্বালা।

সেই জ্বালাতেই সে আবার একদিন আর একজনের ভালবাসায় সাড়া দিতে বাধ্য হল। তারপর অনেক ঝড়ঝাপটার ভেতর দিয়ে মল্লিকা তার সুন্দর চেহারা, যৌবন, কিছুটা লেখাপড়ার জোরে 'মালতী-নিবাসে' আশ্রয় পেয়েছে। সে জানে বিয়ে তার আর কখনো হবে না। কোন পুরুষই তার সমস্ত কলঙ্কিত অতীত জানবার পর তাকে আর সহধর্মিনীর পবিত্র মর্যাদা দেবে না। সে সাধও আর তার নেই। সব বুঝে বর্তমান জীবনকেই সে নির্বিবাদে মেনে নিয়েছে।

'সেদিন ভাই আমার যে কী অবস্থা!' কাঁদো-কাঁদো গলায় হেনা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল, 'জবা তুই ভাল নাচতে পারিস বলে তোকেই সেই 'মাইফেল পার্টি'র' লোকেরা নিয়ে যাবে বলে মাসীর কাছে কথাবার্তা বলে আগাম টাকা দিয়ে গিয়েছিল। তুই তো মাসীর সঙ্গে রাগারাগি করে ওদের সঙ্গে গেলি না। মাসী অনেক বুঝিয়ে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে শেষ পর্যন্ত আমাকেই সেখানে পাঠালে। কত করে বললাম, আমাকে একা পাঠিও না। তুমিও সঙ্গে চল। মাসী বললে ওরা নাকি খুব ভদ্রলোক। মাসীর খুব জানাশোনা। কোন ভয় নেই। যেতেই হল। কিন্তু ভদ্রলোক না ছাই! সব ক'টাই নচ্ছারের বেহদ্দ। মদ খেয়ে এমন বেলেল্লা কাণ্ড-কারখানা করতে লাগল যে আমি ভয়ে মরি। নিজেরা তো মাতাল হলই, আবার আমাকেও গ্লাসের পর গ্লাস খাওয়াল...তারপর বুঝতেই পারছিস। কতক্ষণ আর জ্ঞান থাকে মানুষের? নেহাত আমার স্বাস্থ্য খুব ভাল, তাই রক্ষে। জুঁই হলে মরে যেত। মোটা টাকা দেয় বলে মাসী এমন এক একটা পার্টি ধরে আনে।'

'মাসীর টাকার লোভ মলেও যাবে না।' টগর কটূক্তি করল।

'পুরুষগুলোরও মেয়েমানুষের শরীর নিয়ে মাতাল হবার লোভ মলেও যাবে না।' চামেলি সঙ্গে সঙ্গে সায় দিল।'

'জুতোর বাড়ি মেরে ঠাণ্ডা করে দিতে হয় এইসব জানোয়ারগুলোকে।' জবা ক্ষিপ্ত হয়ে আবার বিছানার ওপর উঠে বসল। 'হ্যাংলা, মেয়েমানুষ-ক্যাংলা পুরুষগুলো বাড়িতে বৌ রেখে এসে বাইরে সুখ খুঁজবে। পয়সা খরচ করে আমাদের ওপর দিয়ে যত সব নোংরা বদখত শখ মেটাবে। নিজেরা মাতাল হবে, সেই সঙ্গে আমাদেরও মাতাল করবে। না হলে ওদের নরক গুলজার হবে কেন? তারপর শখ মিটে গেলে আবার সতী সেজে বাড়ি ঢুকবে। যেন তুলসীপাতা, গঙ্গাজলে ধোয়া নিষ্পাপ মানুষটি সাধু পুরুষটি। আর আমরা? ক'টা টাকার জন্যে কী না করতে হয়, ভাবলেও—'

'জবাদি, চুপ চুপ, মাসী আসছে—' জুঁই সভয়ে অশান্ত উত্তেজিত জবার মুখে হাত চাপা দিয়ে তখনকার মত তাকে জোর করে থামিয়ে দিল।

জবার রূপ বেশী। যৌবন, উদ্ধত বেপরোয়া উত্তেজক। তাই তার সাহস বেশী। রাগ বেশী। আকর্ষণ বোধহয় সেইজন্যে আরো বেশী।

মালতী সেনের 'হাই সোসাইটির' বড় বড় মক্কেলরা, যারা একবার এই রূপবতীটির সঙ্গ পেয়েছে, তারা তাই বার বার ওকেই চায়। ওর রেট সবচেয়ে বেশী। জবাকে নিজের কাছে রেখে নিজের হাতে শিখিয়ে-পড়িয়ে মেয়ের মত করে মানুষ করার পর, তার শরীরে যৌবন আসার পর মালতী সেন সুখের মুখ দেখেছেন। দীন অসচ্ছল অবস্থা থেকে প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যের সাগরে সাঁতার কাটতে শুরু করেছেন। জবাকে তিনি যতটা ভালবাসেন, মনে মনে সমীহ করেন তার চেয়ে অনেক বেশী। জবার প্রতি একটা অদ্ভুত আকর্ষণও তাঁর আছে। মায়ামমতাও। সুন্দরীর জন্যে মারামারি কাটাকাটি সবযুগে সর্বকালে। সতীই হোক অথবা অসতীই হোক, রূপবতীর চরিত্র নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। বরং সে বহুবল্লভা, সহজলভ্যা হলে পুরুষেরা খুশীই হয়ে থাকে।

মালতী সেনের মক্কেলদের মধ্যে যাদের পয়সা বেশী, যারা দু'হাতে খরচ করতে পারে, তারা জবাকেই আগে চায়। সপ্তকন্যাদের মধ্যে জবার দাম সবচেয়ে চড়া।

মিঃ মেহতা, লক্ষ্মীনারায়ণ পাণ্ডে, হুকুমচাঁদ, মিঃ পটাশংকর, জন পিটার্স, রায় ঘোষ চ্যাটার্জী...ইত্যাদি মোটা টাকা-দেনেওয়ালার দল দরকার হলেই আগে মালতী সেনের কাছে জবাকেই প্রার্থনা করেন।

সুতরাং জবা যেন সদাসর্বদা নীলামে চড়ে আছে।

যে বেশী টাকা কবুল করবে, সে-ই জবাকে পাবে। সে যেমন মানুষই হোক না কেন। তার স্বভাব যত কুৎসিত আর জঘন্য হোক না কেন।

আজ এ। কাল ও। পরশু আর একজন। নিত্য নতুন।

মাঝে মাঝে অসহ্য হয়ে ওঠে। বিদ্রোহ করে ওঠে জবার মন।

মনে পড়ে যায় বাবার কথা। মায়ের কথা। স্বর্গের মত সুখের আনন্দের তার ছেলেবেলার দিনগুলোর কথা।

মালতী সেনের অন্যান্য মেয়েদের মত জবা কোন স্খলন-পতনের পিছল পথ বেয়ে এখানে আসেনি।

জুঁই মল্লিকা টগর হেনাদের মত জবার শরীরে কোন কলঙ্কের দাগ ছিল না। জবার বিগত জীবন নিষ্পাপ নিষ্কলুষ। আরো পাঁচটা ভদ্র সুস্থ সামাজিক মেয়েদের মত।

শুধু জবার ভাগ্যটা বড় মন্দ বলেই মালতী-নিবাসে আরো ক'জন পতিতা পণ্যা মেয়ের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে একাকার করে এই অবাঞ্ছিত জীবন যাপন করতে হচ্ছে তাকে।

স্বেচ্ছায় কোন মেয়ে এ পথে আসতে চায়? এই নরকে?

আজ মনে হয় কত দিন কত যুগ কত বছর আগেকার কথা।

মনে হয় কোটি বছর অর্বুদ নির্বুদ বছর পার হয়ে গেছে। তখন কল্যাণীর জন্ম হয়নি। জবারও জন্ম হয়নি। তখন শুধু মণি একটা ছোট সুন্দর ডল পুতুলের মত শিশু হয়ে জন্ম নিয়েছিল অতি সুখী স্বামী-স্ত্রীর সুখের সংসারে।

তখন ও ছিল মণি। বাপ-মায়ের চোখের মণি, আনন্দের খনি। পৃথিবীর সব সুখ-শান্তি মণিকে ঘিরে আবর্তিত হত দুটি নতুন বাপ-মায়ের চোখের মণি, আনন্দের খনি। পৃথিবীর সব সুখ-শান্তি মণিকে ঘিরে আবর্তিত হত দুটি নতুন বাপ-মায়ের কাছে।

জবার বাবা সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মানুষ ছিলেন। মোটামুটি একটা ভাল চাকরি করতেন মীরপুরে। সুন্দরী বৌটিও একেবারে তাঁর সঙ্গে যেন একটা অচ্ছেদ্য ছায়ার মত মিলিয়ে থাকত।

শুধু সুন্দরী নয়। মণির মা অনেক গুণে গুণবতী ছিল। ভাল গান গাইতে পারত, লেখাপড়াও জানত। অসম্ভব খাটতে পারত। সুনিপুণা সুগৃহিণীর মত গুছিয়ে সংসার করত। স্বামীকে প্রাণ-মন দিয়ে ভালবাসত। সেবা-যত্ন করত। মণিকে স্নান করানো, খাওয়ানো, জামা পরানো, ছড়া শেখানো, লেখাপড়া শেখানো এই সমস্ত কাজ নিয়ে মণির মা সদাসর্বদাই ব্যতিব্যস্ত থাকত।

জ্ঞান হবার পর থেকেই মণি দেখে এসেছে, অফিস থেকে ফিরতে একটু দেরী হলেই মণির মায়ের সে কী উৎকণ্ঠা!

জানলায় দাঁড়িয়ে থাকা, দরজা খুলে বার বার বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এসে পথের দিকে তাকিয়ে থাকা! দূর থেকে বাবাকে দেখতে পেলেই, দুজনের চোখাচোখি হলেই দুজনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত। হাসি ফুটে উঠত।

বাবা বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতেই মণি তাঁর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। কী আদরই না করতেন তিনি মণিকে। তারপর হাত-মুখ ধুয়ে মা বাবা আর সে একসঙ্গে চা খেতে বসত। চায়ের সঙ্গে মণির মায়ের হাতের তৈরী করা নিত্য নতুন জলখাবার। সিঙাড়া কচুরি অথবা চপ কাটলেট লুচি বা পরোটা তরকারি এই সব।

মাঝে মাঝে চায়ের আসরে বাবার অন্তরঙ্গ বন্ধু দু' একজন নিমন্ত্রিত হতেন। সেদিন মণি আড়ষ্ট হয়ে থাকত। বাবা আর মা ছাড়া অন্য কাউকে তার একটুও ভাল লাগত না।

কোন কোন দিন মণিকে নিয়ে ওঁরা বেড়াতে যেতেন। কখনো সিনেমায়। কখনো নদীর ধারে। বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা ওদের বেশী ছিল

না। আত্মীয়-স্বজন তেমন কেউ ছিল না।

এই দুটি স্বামী-স্ত্রী তাদের একটিমাত্র সন্তানকে নিয়েই যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিলেন। কোন অভাব-অভিযোগ কোন অশান্তি তাদের সুখের সংসারে ছায়া ফেলতে পারেনি।

কী সুগভীর ভালবাসাই না ছিল ও'দের দুজনের মধ্যে!

কতদিন মণি দেখেছে, শুক্লপক্ষে চাঁদের আলোয় উঠোনে মাদুর পেতে ওর বাবা শুয়ে আছেন। ওর মা বাবার কোলের কাছে বসে গান গাইছে। একটার পর একটা।

বাবার সামান্য অসুখ হলে মা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠত। আবার মায়ের মাথা ধরলে বাবা নিজেই জোর করে ও'কে শুইয়ে বসে বসে মাথা টিপে দিতেন।

এই দুটি নরনারীর পবিত্র সম্বন্ধের, সুগভীর ভালবাসার মধ্যে মণির জন্ম। বাবা আর মায়ের সুন্দর ছবিটিই ওর মনের মধ্যে পাথরে খোদাই করা অক্ষরের মত দাগ কেটে বসেছিল।

ছোট্ট মণি এই ভালবাসার পরিবেশের মধ্যে ক্রমশঃ বড় হতে লাগল। স্কুলে ভর্তি হল। লেখাপড়া শিখতে লাগল।

পৃথিবীর মানুষদের প্রকৃত ভালবাসা সুখ শান্তি বোধহয় স্বর্গের দেবতাদের চক্ষুশূল হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না।

হঠাৎ একদিন পেটে ব্যথা নিয়ে গায়ে জ্বর নিয়ে মণির বাবা অফিস থেকে বাড়ি ফিরে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। সামান্য অসুখটা ক্রমশঃ অসামান্য হয়ে উঠল। বড় বড় ডাক্তার এল। বিশেষজ্ঞ। তারপর হাসপাতাল। কেবিন নার্স। অপারেশন। জলের মত টাকা ঢালতে লাগল মণির মা। পাগলের মত ঠাকুর-দেবতার কাছে মানত করতে লাগল! তারকেশ্বরে হত্যা দিয়ে এল, স্বামীর প্রাণের জন্যে! গায়ের গয়না শেষ হল। সম্বল যা ছিল সব গেল।

প্রায় ছ-সাত মাস নিজে ভুগে যন্ত্রণা পেয়ে মণির মা আর মণিকে যন্ত্রণা দিয়ে একরকম পথে বসিয়ে মণির বাবা একদিন ওদের ছেড়ে চলে গেলেন।

এই ছ-সাত মাসের অবিশ্রাম স্বামী-পরিচর্যা, শারীরিক মানসিক

উৎকণ্ঠা, ভাবনা-চিন্তার ফল ফলতে দেরী হল না। মণির মা-ও কঠিন অসুখে পড়ল, স্বামী মারা যাবার পরই।

দশ-এগারো বছরের মণি তখন শোকবিহ্বল, অসহায়। পাশে এসে দাঁড়াবার মত আত্মীয়স্বজনও কেউ নেই। মহাদুর্দিনে যা স্বাভাবিক, তাই হল। যা ঘটা উচিত ছিল, তাই ঘটল।

রূপবতী যুবতী বন্ধুর স্ত্রীকে সেবা যত্ন দেখাশোনা করার জন্যে অনেকেই এসেছিলেন। প্রতিবেশীরা, মণির বাবার অফিসের বন্ধুরা। মণির মায়ের একজন দূর-সম্পর্কের বড়লোক দেওর কলকাতা থেকে মীরপুরে এসেছিল, ওদের এই দুঃসময়ে মণির মায়ের চিঠি পেয়ে।

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, মণির সেই কাকাটিই অসহায় মা-মেয়ের অভিভাবক হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিঃসম্বল বিধবা আর তার মেয়েকে সেবা যত্ন সঙ্গ সাহচর্য দিয়ে সুস্থ করে তুলল। দুহাতে পয়সা খরচ করতে লাগল ওদের জন্যে। মণির বাবার অসুখের জন্যে অনেক টাকা ধার-দেনা হয়েছিল, মণির কাকা সব শোধ করে দিল।

মণির কাকাটির লোহালক্করের ব্যবসা। প্রচুর পয়সা। চেহারাটাও রমণীমোহন। বয়সও চল্লিসের নীচে। ব্যবসা ফেলে রেখে মীরপুরে সুন্দরী যুবতী বিধবা বৌদিকে দেখাশোনা করা সম্ভব নয় বলে, আর এখানেও ওদের দুজনের একা একা অভিভাবকহীন অবস্থায় থাকা সম্ভব নয় বলে, একদিন মা মেয়েকে নিয়ে কলকাতায় চলে এল।

ওদের জীবনে নতুন অধ্যায়ের শুরু হল। শুরু হল কুটিল জটিলতা।

তার পরের ঘটনাগুলো যেন পর পর সাজানোই ছিল। ঘটবার অপেক্ষায়—একটার পর একটা—নাটকের অঙ্কের মত, দৃশ্যের পর দৃশ্যের মত, ওদের মা-মেয়ের জীবন দুটো এক অমোঘ অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে ভেসে চলল।

নিরুপায় অসহায় নিঃসম্বল মণির মাকে সেই নির্মম ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পণ করতে হল। সেই দুঃসময়েই ঘটনাচক্রে মালতী সেনের সঙ্গে তার পরিচয় হয়ে গেল। মালতী সেন আসলে মানুষটা মন্দ ছিলেন না। সেই পরিচয় থেকেই ক্রমশ ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হলেন তিনি মণির মায়ের।

মণির কাকা বেশীদিন ওদের ভার বইল না। ক্রমশ জানা গেল, এক নারীতে বহুদিন আসক্তি নাকি কাপুরুষের লক্ষণ, যেটা তার স্বভাবে একেবারেই নেই।

মণির মা দুচোখে অন্ধকার দেখল।

কিন্তু সেও বেশীদিনের জন্যে নয়।

মণির কাকার পূর্বপরিচিতা বান্ধবী মালতী সেনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় (মণির কাকাই করিয়ে দিয়েছেন) আগেই হয়েছিল। তিনিই ওদের এই মহাবিপদে বিপত্তারিণী রূপিণী হয়ে মণির মায়ের পাশে এসে দাঁড়ালেন। মণির মায়ের চোখের জল মুছিয়ে অনেক বোঝালেন। মণির কাকাটি যে কী ধরণের মানুষ সেটাও তাকে ভাল করে জানিয়ে দিলেন।

তারপর মণির মায়েদের যা অবস্থা সাধারণত হয়ে থাকে, এ ক্ষেত্রেও তাই হল।

মালতী সেনের কৃপায় ও সাহায্যে অনেক বাবুই ওদের এই বিপদে রক্ষকের ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে এল। জাহাজের অফিসের সতীনাথবাবু, পাটের কারবারী হুকুমচাঁদবাবু, থিয়েটারের রজনীবাবু, আরো ক'টি বাবু একের পর একজন করে ক' বছর ধরে মণির মা ও মণির রক্ষণাবেক্ষণ ভরণপোষণ করল।

এমন একটা জঘন্য জীবনযাপনের কথা কখনো কল্পনাও করতে পারেনি মণির মা।

মণির কাকা তাকে বড় বড় কথা বলেছিল। অনেক আশা অনেক উৎসাহ দিয়েছিল। কিন্তু একটা বছর কাটতে না কাটতেই সে যে এতবড় বিশ্বাসঘাতকতা করবে, সে কথা সে ভাবতে পারেনি।

অসময়ের বন্ধু, বিপদের বন্ধু বলেই অতখানি বিশ্বাস করতে পেরেছিল। এমন অবস্থায় পড়তে হবে জানলে সে মীরপুরে মাটি কামড়ে পড়ে থাকত মেয়েকে নিয়ে। অন্য কোন কাজ না জুটুক, লোকের বাড়ি রান্না করে বাসন মেজে মেয়েকে মানুষ করত।

এমন ভাবে বাঁচতে চায়নি সে।

কোন মেয়েই বা চায়?

তবে এই অবাঞ্ছিত, সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধ জীবনযাপনের গ্লানি

বেশিদিন সহ্য করতে হল না মণির মাকে। অসময়ের বন্ধু মালতী সেনের হাতে তেরো বছরের মণিকে তুলে দিয়ে মণির মা সব যন্ত্রণা থেকে মুক্তি নিয়ে তার বড় ভালবাসার স্বামীর কাছে চলে গেল।

মরবার আগের দিন পর্যন্ত মালতী সেনকে মণির মা তার শেষ ইচ্ছার কথা বার বার বলেছিল। নিরুপায় অসহায় মায়ের দোষে যেন মেয়ের জীবন ব্যর্থ না হয়।

মণি যেন কোনমতে ঘৃণ্য জীবনযাপন না করে। গরীব হোক, দুঃস্থ হোক, মালতী সেন কোন শিক্ষিত ভদ্র ছেলের সঙ্গে মণির বিয়ে দিয়ে তাকে সুস্থ সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দেন। আজকাল খুব খারাপ মেয়েরাও তো ভালবেসে বিয়ে করে একটি স্বামীকে নিয়ে ঘর-সংসার করছে।

মণিকেও, তার একমাত্র সন্তানকেও বার বার বলেছিল, এ জীবন থেকে দূরে চলে যেতে। সুবিধে পেলেই। এখানে সুখ শান্তি থাকে না, একনিষ্ঠ ভালবাসা থাকে না। শুধু থাকে অর্থ।

কিন্তু সে অর্থও পাপের। সে অর্থও সুখ দিতে পারে না। কারু কাছে সহানুভূতির প্রত্যাশা থাকে না। এখানকার ঘর তাসের ঘর। যতই তুমি গড় না কেন, মাত্র দুদিনের আয়ু। হাওয়ায় সে ঘর ভেঙে যাবেই। শিকড়হীন বৃক্ষের মত। ভালবাসার মানুষ আসে, আবার দুদিন বাদে চলে যায়। স্রোতে ভাসা কুটোর মত।

তুমি কারু নও, কেউ তোমার নয়। যতক্ষণ তোমার রূপ, যৌবন, শরীর—ততক্ষণ তারা। স্থায়ী এখানে কিছুই নয়। তোমার যৌবন রূপলাবণ্যও যেমন নয়, তার বদলে পাওয়া টাকা-পয়সাও তেমন নয়। একটি মানুষকে ভালবেসে তার পত্নীত্ব গ্রহণ করে, তার দাসী হয়ে থাকাটাকে যেন মণি পরম সৌভাগ্য বলে মনে করে। তাতেই নারী-জীবনের সার্থকতা। ধর্ম। পুণ্য। সবকিছু।

মায়ের এই শেষ অনুরোধ, শেষ ইচ্ছার কথা মনে পড়লেই জবার সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে আসে। নিজের মনের গভীরে সে যেন তার মায়ের করুণ কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। এই উত্তেজক অনিশ্চিত বিপজ্জনক জীবন

থেকে সেই মুহূর্তে বহুদূরে পালিয়ে যেতে ইচ্ছা হয় জবার। অনেক দূরে। এই পাপের শহর ছাড়িয়ে বহুদূরে।

ভাল লাগে না—ভাল লাগে না—এই নিত্য নতুন মানুষের আলিঙ্গনে নিজেকে সঁপে দেয়া। নিত্য নতুন মানুষের মুখে সেই একঘেয়ে পুরনো কথা শোনা। তাদের শখ মেটানো।

হাজার মানুষের নয়নের মণি লালসার খনি হৃদয়ের রাণী হয়ে থাকার চেয়ে একজন অতিসাধারণ মানুষের ঘরের ঘরণী হয়ে থাকার মর্যাদা অনেক বেশী। সুখ-শান্তিও বেশী।

তাই এ পথের মেয়েরাও সুযোগ-সুবিধা পেলেই একজন মানুষকে আঁকড়ে ধরে সংসারী হতে চায়।

'কেত্‌না সুন্দর হ্যায় তুম্।'

জবার প্রায় নিরাবরণ দেহটার দিকে মুগ্ধ বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে 'বিশুদ্ধ অন্নপূর্ণা সরিষার তৈল' কোম্পানীর মালিক লোহারাম আগর-ওয়ালার চোখ দুটো লোভে লালসায় চক চক করতে থাকে।

ক্ষুধার্ত কুকুরের মুখের সামনে জবা যেন এক টুকরো টাটকা মাংসখণ্ড। নরম কচি, রক্ত-মাখানো।

'সত্যি।' জবার চোখ দুটোও কঠিন বিদ্রূপে ধারালো হয়ে ওঠে।

'সাচ্ বলছি তুমাকে। তুমহার মত খাপসুরত লেড়কী হামি কভি দেখিনি। তুমাকে দেখবার পর আউর কাউকে হামার ভাল লাগে না।' আগরওয়ালার হাত জবার শরীর হাতড়ে বেড়ায়।

বোতল থেকে আরো খানিকটা স্কচ্ ঢেলে সোডা মিশিয়ে গেলাসটা লোহারামের মুখের কাছে ধরে জবা। 'খান। যত খাবেন, আমাকে তত ভাল লাগবে। সাদা চোখে আমাকে যতটা ভাল লাগে, লাল চোখে তার চেয়ে আরো হাজার গুণ বেশী ভাল লাগবে।'

অতিরিক্ত মোটা শরীর নিয়ে, বৃহৎ ভুঁড়ি নিয়ে অত্যন্ত কাহিল লোহারাম জবার আপ্যায়নে গদ গদ বিগলিত হয়ে ওঠে। 'কী যে তামাশা করছো জবারাণী! সাদা চোখে লাল চোখে তুমি সমান আছো। তোমার মত এমন সুন্দর লেড়কী আমি কোথোনো দেখিনি। বিস্‌ওয়াশ হচ্ছে না?

শ্রীরামজীর নাম নিয়ে বলছি।'

'কেন, আপনার পরিবার? উনি সুন্দর নন?'

'হায় রাম! এত্‌না মোটা আছে। আমার পসন্দ্‌ হয় না ওকে।' মুখবিকৃত করে ঘন ঘন ঘাড় নাড়তে লাগল আগরওয়ালা।

'বেশ তো, বৌকে পছন্দ না হয়, আমাকে বিয়ে করুন না। দিনরাত আপনার ঘরে থাকব, চোখের সামনে ঘুরে বেড়াব। যখন ইচ্ছে ভাল-বাসবেন, আদর করবেন বাড়তি টাকা খরচ করতে হবে না।'

আগরওয়ালার চোখ-মুখে বিস্ময়ের বিন্যাস। 'আমাকে তুমার মত জোয়ানী খাপসুরত লেড়কীর পসন্দ্‌ হবে কেন?'

'খুব পছন্দ হবে। কত টাকা-পয়সা আপনার। আপনি একটু মোটা, এই যা। কিন্তু তাতে কী হয়েছে? বিয়ের পরও তো কত মেয়ের স্বামী মোটা হয়ে যায়। আমি আপনাকে বিয়ে করতে এখুনি রাজী আছি। আপনি রাজী তো?'

'সীয়ারাম সীয়ারাম! কী যে বল জবারাণী! এক দফে সাদী কিয়া। এরোকোম কোথা মৎ বল। তোমাকে আমি বহুত পেয়ার করব। লেকিন…'

'লে[illegible] বিয়ে করতে পারবেন না! এই তো? কিন্তু কেন?'

'ওই [illegible] বললাম, ঘরে আমার পরিবার আছে। বাল বাচ্চা আছে। এক পরিবার থাকতে কি অন্য কাউকে সাদী করা যায়?'

'সে তো মুটকী। তাকে তো আপনি পছন্দ করেন না।'

'পসন্দ্‌ না করলে কি হবে? আমি তো তাকে ইচ্ছে করে সাদী করিনি। আমার বাবা ঠাকুর্দা মিলে জুলে দেখে শুনে তার সঙ্গে আমার সাদী করিয়ে দিয়েছে। তারপর বহুত বয়ষ কেটে গেছে। বালবাচ্চা হয়েছে, তারা বড় হয়ে গিয়েসে। এখন ফিন কি আর সাদী করা যায়? লোকে কি বলবে?'

'ওহ্‌ লোক লজ্জা! তা সে লজ্জা সরম কি আর আপনাদের আছে? তাহলে আমাদের কাছে আসেন কেন?'

'সে তো ছুপকে ছুপকে মানে লুকিয়ে লুকিয়ে আসি জবারাণী। কেউ জানতে পারে না। সারাদিন বেব্‌সার জন্যে কত খাটা-খাটুনি, এখানে ওখানে ছোটাছুটি করতে হয়। রুজি রোজগারের জন্যে কত্তো ধান্দা ভি

করতে হয়। মাঝে মাঝে একটু ফুর্তি উর্তি না করলে মনমেজাজ আচ্ছা থাকবে কেন?'

জবা লোহারাম আগরওয়ালার থলথলে চর্বিভরা মুখের দিকে, লাল-লাল, ছোট ছোট ধূর্ত দুচোখের দিকে বিতৃষ্ণা ভরা তীব্র চোখে তাকিয়ে বললো ; 'আপনার পরিবারও তো সারাদিন খাটা খাটুনি করে। বালবাচ্চাদের দেখাশোনা করে। সংসারের কাজকর্ম করে। আপনার সেবা যত্ন করে, নয়কি?'

লোহারাম ঘন ঘন মাথা নেড়ে জবার কথায় সায় দিল ; 'তা ঝুট বাত বলব না। সারাদিন কাজ করে। আমাকে বহুত যত্ন ভি করে। আমার পরিবার খুব ভাল মানুষ আছে।'

'তাই যদি হয়, তাহলে আপনি কেন তাকে এমন করে ঠকাচ্ছেন? তাকে লুকিয়ে কেন আপনি আমাদের মত খারাপ মেয়েদের কাছে আসেন?'

জবার কণ্ঠস্বরের ঝাঁজে ঘাবড়ে গিয়ে লোহারাম বললো, 'ওই তো বললাম, সারাদিন খাটা খাটুনি করি। তাই থোড়া ফুর্তি উর্তি করতে এখানে আসি।'

'তা আপনার বৌয়ের ফুর্তি উর্তি করার দরকার হয় না বুঝি? ওসব বুঝি পুরুষদেরই এক চেটে?' জবা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের তীরে লোহারামকে বিদ্ধ করলো ; 'আপনিও তো হাতীর মতন মোটা। আপনার যেমন বৌকে পছন্দ হয় না, আপনার পরিবারেরও তো তেমনি আপনাকে পছন্দ হতে নাও পারে? আপনি তাকে লুকিয়ে আমাদের কাছে ফুর্তি করতে আসেন। আপনার পরিবারটি ফুর্তি উর্তি করতে কোথায়, কার কাছে যান?'

লোহারাম এতখানি জিভ বার করে বললো ; 'আরে ছিয়া, ছিয়া! জবারাণী, তুমি কি বলছো? আমাদের বাড়ির বৌ ওইসা মাফিক খারাপ কাজ কভ্‌ভী করবে না। সেতো বাড়ির থেকে বাহারই হয় না। কখনো কখনো গঙ্গা স্নানে, কালীমাঈকী মন্দিরমে যায়। কখনো সিনেমা থিয়েটার যায়। সব সময় বাড়ির কোন লোক সঙ্গে থাকে। একলা যায় না,

জবা এবার ছুরিচেরা গলায় হেসে উঠল : 'স্ত্রীর ওপর আপনার দেখছি খুব বিশ্বাস! তা, আপনার ওপরও তার বোধ হয় এই রকম গভীর বিশ্বাস আছে। আপনিও যেমন তার বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখছেন, তিনিও বোধকরি তেমনই রাখছেন। ভাল করে খোঁজ খবর নিয়ে দেখুন গে যান মিঃ আগরওয়ালা। আপনি তাকে লুকিয়ে বাইরে বেরিয়ে, এখানে এসে যেসব মজা লুটছেন, তিনিও বোধহয় বাইরে না বেরিয়ে, নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে আপনার চোখের আড়ালে অন্য কোন পুরুষকে নিয়ে তেমনই ফুর্তি টুর্তি করছেন।

'কী বলছো? অ্যাঁ কী বলছো তুমি জবারাণী?'

'কী বলছি, বুঝতে পারছেন না? বাংলা কথাতো আপনি ভালই বোঝেন লোহারাম বাবু। আমি বলছি, আপনারা পুরুষেরা বাইরে বাইরে যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াবেন, আর আপনাদের পরিবাররা সতীলক্ষ্মী হয়ে ঘরে বসে আপনাদের ঘরে ফিরে আসার প্রতীক্ষা করবে, একথা ভাববার দিন বোধ হয় এখন পার হয়ে গেছে।'

জবার কথায় লোহারাম আগরওয়ালা চমকে উঠল।

হাসি মুখ গম্ভীর হয়ে গেল।

কয়েক মুহূর্ত জবার মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন বুঝতে চেষ্টা করলো।

তারপর জবার হাত থেকে পানীয় ভর্তি গ্লাসটা টেনে নিয়ে, এক চুমুকে সেটা নিঃশেষ করে জড়ানো গলায় বললো : 'আজ তোমার কী হয়েছে বলতো জবারাণী? খারাপ খারাপ কথা বলে আমাব মেজাজটা নষ্ট করে দিচ্ছ!'

লোহারামের হাত থেকে শূন্য গ্লাসটা নিয়ে, তাতে আরো খানিকটা হুইস্কি ভরে দিতে দিতে জবা বললো, 'নাহ্ আর আপনার মুড নষ্ট করে দেব না। এই নিন, ধরুন···শেষ করে ফেলুন। মুড ফিরে আসবে।'

'সত্যি জবা তোমার মত এমন সুন্দরী মেয়ে আমি খুব কমই দেখেছি।'

'কী যে বলেন আপনি।' জবার চোখে বিদ্যুৎ ঝলসায়। 'আপনাদের

সিনেমা লাইনে কত সুন্দর সুন্দর মেয়ের ছড়াছড়ি। তাদের কাছে আমি কিছুই না।'

'সিনেমায় নামতে আসা মেয়েরা!' সিনেমা ডিরেক্টর চ্যাটার্জীর মুখে একটুকরো বিদ্রূপের হাসি ফুটে ওঠে। 'দেখে শুনে চোখ পচে গেছে। তাদের সঙ্গে তোমার তুলনাই হয় না। তোমাকে কতবার বলেছি! রাজী হও তো বল। আমার নেক্সট্ বইয়ে তোমাকে একটা চান্স দি। অবশ্য প্রথমেই নায়িকার পার্ট নয়। দু একখানা বইয়ে এক্সট্রা, সাইড পার্ট, উপনায়িকা—এই গোছের ভূমিকার পর একেবারে নায়িকা। মনে হয় তুমি ভালই পারবে। যা একখানা ফিগার তোমার!'

'নায়িকা!'

চ্যাটার্জীর আলিঙ্গন থেকে জোর করে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে জবা রূঢ় গলায় জবাব দিল, 'কত বই দেখলাম। কত নায়িকা উপনায়িকা এক্সট্রাদেরও দেখলাম। পর পর বইগুলো ফ্লপ করে, সংগে সংগে আপনাদের বেশীর ভাগ নায়িকা উপনায়িকা এক্সট্রার দল আমাদের লাইনে এসে ভীড় জমায়। সোজাসুজি গলিতে দাঁড়ায় না বটে, তবে 'কলগার্ল' হয়ে আপনাদের কাছে মোটা টাকায় ঘোরাঘুরি করে। তার চেয়ে যেমন আছি সেই ভাল। আপনার বইয়ে নায়িকা হবার মত ভাগ্য করে আসিনি চ্যাটার্জী সাহেব। ও পোস্টটা অন্য কোন সৌভাগ্যবতীর জন্যেই বরং তোলা থাক।

জবার রূঢ়তায় ক্ষুব্ধ হন চ্যাটার্জী সাহেব। 'দেখ জবা, নায়িকা হবার মত যোগ্যতা সব মেয়ের থাকে না। শুধু চেহারা নয়, ব্যক্তিত্ব স্মার্টনেস কণ্ঠস্বর আরো অনেক কিছুই দরকার হয়। তোমার মধ্যে সে সমস্ত গুণগুলো আছে বলেই বার বার ছুটে ছুটে আসি। অনুরোধ করি। তুমি বিশ্বাস কর চাই না কর, সত্যিই তোমাকে আমি ভালবাসি। অনেকের কাছ থেকে অনেক ভালবাসা পাও বলে তুমি আমার ভালবাসাটাকে একেবারে নস্যাৎ করে দাও। কিন্তু বিশ্বাস কর—'

'করলাম।' জবা আবার চ্যাটার্জীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে দুহাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে। রক্তাক্ত অধরের হাসিটাকে ঠোঁটের দুকূলে ছড়িয়ে কাজলটানা চোখের দৃষ্টিতে আগুন জ্বেলে মদির কণ্ঠে বলে, 'বিশ্বাস

করলাম যে আপনি আমাকে সত্যি সত্যিই ভালবাসেন।'

'তবে অমন কর কেন?' চ্যাটার্জীর দুচোখে নেশা। 'অমন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ? ঠাট্টা-তামাশা?'

'কেন করি? আচ্ছা আমার একটা কথার জবাব দিন। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে তো আপনার ডিভোর্স হয়ে গেছে। আপনি নিঃসঙ্গ। একলা থাকতে ভাল লাগে না বলে আমার কাছে প্রায়ই আসেন। আর আমিও ভদ্রঘরেরই মেয়ে। আপনার মনের মত সুন্দরী গুণবতী মেয়ে। আপনি আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালও বাসেন। বেশ তো, আমাকে বিয়ে করুন না?'

'বিয়ে করব! পাগল না মাথা খারাপ!' চ্যাটার্জী হাসতে হাসতে বলেন, 'ভালবাসা এক জিনিস, আর বিয়ে করা আর এক জিনিস। ম্যারেজ ইজ এ সিরিয়স বিজনেস। একবার হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। অসহ্য হয়ে উঠেছিল শেষ পর্যন্ত। একবার যখন মুক্তি পেয়েছি—'

'তখন কোন বন্ধনে বাঁধা পড়ার কোন মানেই হয় না। তখন ফুলে ফুলে মধুপান করে বেড়ানোই ভাল। আজ জবা কাল টগর পরশু হেনা গোলাপ চামেলি...কী বলেন, অ্যাঁ?'

'কী যে বল তুমি জবা।'

জবা খিল খিল করে হেসে ওঠে। 'যা বলি, একেবারে বাজে কথা নয়। সত্যিই তো, আপনাদের মত মানুষদের ঘরে ঘরে কড়া পাহারাদার সহধর্মিণীরা থাকলে আমাদের মত মেয়েদের কী নিদারুণ অবস্থাই না হত। ভাবতেও ভয় লাগে। কবে আমাদের ব্যবসা লাটে উঠত। চ্যাটার্জী সাহেব, ডিভোর্স করে আপনার স্ত্রীই মুক্তি পেয়েছেন বলে আমার মনে হচ্ছে কিন্তু। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার মত মানুষকে বিয়ে করতে আমি কেন, আমার চেয়েও নীচু স্তরের মেয়েরাও রাজী হবে না।'

জবার কথা শুনে চিত্রপরিচালক চ্যাটার্জীর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। জবার মুখের দিকে তাকিয়ে নীরস গলায় বললো; 'খুব যে বড় বড় কথা শোনাচ্ছ। তোমরা নিজেদের কী ভাব বলতো? তোমার চেয়ে অনেক নীচু স্তরের মেয়েরাও আমাকে বিয়ে করতে রাজী হবেনা, না? ওই ধারণা নিয়েই এই লাইনে পড়ে থাক। এই কলকাতা সহরেরই অনেক কোটিপতি লাখপতি বড় বড় লোকের উচ্চশিক্ষিতা সুন্দরী মেয়েরা আমাকে স্বামী

হিসেবে পেলে, বর্তে যাবে। তু' বলে ইসারায় ডাকলে, ছুটে এসে পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বে।'

'ওমা! তাই বুঝি?'

জবার মুখের হাসি, কণ্ঠস্বরের কৌতুকে চ্যাটার্জী আরো চটে উঠলো; 'কেন, পাত্র হিসেবে আমি কি ফ্যালনা? আমার বয়স এখনো চল্লিশ পেরয়নি। দেখতে শুনতে একেবারে খারাপ নই। নিজের একখানা বাড়ি, একটা ছোটখাট গাড়িও আছে। ভাল রোজগার করি। ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি আছে। বার দুয়েক বিদেশে ঘুরেও এসেছি। এই রকম অল রাউণ্ড পাত্র কলকাতা সহরে সহজে মেলেনা।'

'তাহলে আপনার স্ত্রী আপনাকে ছেড়ে চলে গেল কেন? ডিভোর্স করলো কেন?'

'ভয়ংকর সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত বলে। আমার মুখ থেকে হিরোইনদের নাম শুনলেও ওর মাথায় আগুন জ্বলে যেত। নতুন কোন মেয়েকে আমার ছবিতে সাইন করাচ্ছি, একথা জানতে পারলে আমার আর রক্ষা ছিলনা। যা মুখে আসে তাই বলে আমাকে গালমন্দ করতো। ওর ধারণা ছিল, প্রত্যেকটি নায়িকা উপনায়িকার সঙ্গে আমি নষ্ট। বাড়ি ফিরতে একটু রাত হলে, সে এত বেশী চিৎকার চেঁচামেচি করতো, যে পাড়াশুদ্ধ জানাজানি হয়ে যেত। লজ্জায় আমার মাথাকাটা যেত। ওর এই বদ স্বভাবের জন্যে পাড়ার মধ্যে আমি মুখ দেখাতে পারতাম না।

'কী মুশকিলের ব্যাপার।' জবা হাসি চেপে, গালে একটা আঙ্গুল ছুঁইয়ে মন্তব্য প্রকাশ করলো।

'মুশকিল বলে মুশকিল!' চ্যাটার্জীর কপালে পর পর কয়েকটা বিরক্তির রেখা ফুটে উঠল। 'প্রডিউসার, ডিস্ট্রিবিউটারদের সঙ্গে মিটিং করতে কোন বারে গেলে, একটু আধটু ড্রিঙ্ক করে বাড়ি ফিরলে, কী যে অশান্তি করতো, সে কথা বলার নয়।'

জবা মুখ টিপে হেসে বললো, 'একটু আধটু ড্রিংক মাত্র? আউট অফ্ শর্ট নয়? টিপ্‌সি হয়ে নয়? হাই হয়েও নয়?'

চ্যাটার্জীর সামনে এক ডিশ ফ্রায়েড্ প্রন, আর ফিস্ ফিঙ্গার। বোতল গ্লাস তো আছেই। আয়েশ করে পানীয়ে চুমুক দিতে দিতে, সেই

সঙ্গে চাটের স্বাদ নিতে নিতে, ভরা মুখে ও বললো ; 'এক একজন প্রাইভেট ফাইনান্সারকে ঘায়েল করে টাকা জোগাড় করার জন্যে আমাদের মত উচ্চাকাংখী স্বল্পবিত্ত চিত্র পরিচালকদের যে কী কী করতে হয়, মদ, সুন্দরী মেয়ে মানুষ দিয়ে তাকে কী ভাবে তুষ্ট করতে হয়, সেকথা তুমি যে একেবারে না জান, তা নয় জবা। যে দেবতার যে নৈবিদ্য, যে ফুলে যে দেবতা সন্তুষ্ট, তাকে তাই দিয়ে তুষ্ট রাখতে হয়। এ লাইনে এটাই চরম সত্যি কথা। এটা অন্যায়ও নয়, পাপও নয়। আমাকেও তো করে খেতে হবে, বাঁচতে হবে ? বদমেজাজি বৌয়ের হাতে সংসার খরচের, তার হাত খরচের টাকা তুলে দিতে হবে ?'

একটা ফ্রায়েড প্রনের টুকরো চিবোতে চিবোতে জবা সায় দিল, 'তা তো বটেই চ্যাটার্জী 'সাহেব।'

চ্যাটার্জী উৎসাহিত ও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল ; 'কিন্তু সেকথা সে কিছুতেই বুঝতে পারত না। বুঝতে চাইতও না। সারা দিনরাতের মধ্যে যতটুকু সময় বাড়ি থাকতাম, ততটুকু সময় ওর সন্দেহের বিষে আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠতাম। আমাকে ছবি তোলার ব্যাপারে নানা ধান্দায় বাইরে বাইরে ঘুরতে হয়। রাত্রে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে ঘরে ফিরে কোথায় একটু শান্তি পাব, দুটো মিষ্টি কথা শুনবো, একটু যত্ন আত্তি পাব, তা নয়, শুধুই ঝগড়া আর অশান্তি। রোজ রোজ এ কী মানুষের ভাল লাগে ? তুমিই বল না ?'

জবা তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়ল ; 'নাহ্‌ মোটেই না।'

'তাই ও যখন চলে গেল, আমি একটুও বাধা দিইনি। ওর সমস্ত সর্ত মেনে নিয়ে, এক সঙ্গে থোক একটা মোটা অংকের টাকা দিয়ে, ডিভোর্স নিয়ে নিয়েছি। তুমিই বল, ভাল করিনি ?'

'হুঁ। ভালই করেছেন।'

'দেখ, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়। ঝগড়াঝাঁটি মনোমালিন্যও হয়। এটা অল্প সময়ের, খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। আবার মিটমাটও হয়ে যায়। কিন্তু আমার স্ত্রী আমাকে একেবারেই বিশ্বাস করতনা। তার এই অস্বাভাবিক সন্দেহ প্রবণতায় শেষ পর্যন্ত আমার জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল। ও আমাকে ছেড়ে দেওয়াতে আমি মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছি। মনস্থির করে ফেলেছি, সন্দেহপ্রবণতা আর

অবিশ্বাস মেয়েদের রক্তে মিশে আছে। সুতরাং বিয়েটিয়ে আর নয়। অবশ্য তেমন তেমন মনের মতন মেয়ে যদি কখনো দশম আশ্চর্যের মত খুঁজে পাই...তখন বিয়ের কথা ভাববো। তার আগে নয়।'

জবা চ্যাটার্জীর ঘনিষ্ট সান্নিধ্য থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে অলস গলায় বললো; 'আপনার স্ত্রী আপনাকে বিশ্বাস করতনা, কিন্তু তার এই সন্দেহের কি কোন কারণ ছিল না?'

চ্যাটার্জী মদের গ্লাসে ধীরে ধীরে চুমুক দিতে দিতে জবাব দিল; 'মিথ্যে কথা বলবনা। স্ত্রী ছাড়াও আরো অনেক মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করেছি। কিন্তু এটাতো আমার পেশার জন্যে। তেমন তেমন ট্যালেন্টেড, স্মার্ট ফোটোজেনিক ফেসের সুন্দরী মেয়ে দেখলে, তাদের ছবিতে আনার জন্যে চেষ্টাচরিত্র করা, নতুন কোন হিরোইনকে সাইন করানো, একস্ট্রাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় রাখা, এসব তো আমার মত প্রত্যেকটি চিত্র পরিচালককে করতেই হয়। এ ছাড়া, ছবি যাতে ফ্লপ না করে, বিখ্যাত অভিনেত্রীদের যাতে নিজের ছবিতে সাইন করানো যায় সেজন্যে, তার বাড়িতে যাওয়া আসা তাকে নিয়ে ফাইভস্টার হোটেলে খাওয়ানো, এটাও তো, আমাদের করতে হয়। তবে এসব ব্যাপার নিয়ে কেউ কেউ বেশী মাতামাতি করে, কেউ কম করে। এই সব মেয়েমানুষ নিয়ে হুল্লোড়-বাজী করার ব্যাপারে আমার কিন্তু বাজারে বদনাম নেই।'

জবা সরল, নিরীহ মুখে টিপ্পনি কাটল; 'সে ব্যাপারটা আপনি লোক চক্ষুর আড়ালেই বেশ ভাল ভাবে ম্যানেজ করতে পারেন। বাজারের লোকেরা জানতে পারলে, তবেতো বদনাম দেবে? এই যে আপনি আমার কাছে মাঝে মাঝে আসেন, একথাটাও কি কেউ জানে? মোটেই না।'

চ্যাটার্জী জবার কথাটার অন্তর্নিহিত অর্থ ঠিক বুঝতে পারল না। পানীয়ের প্রসাদ গুণে বোঝবার মত অবস্থাও তার তেমন ছিল না। রক্তাভ চোখে জবার মুখের দিকে তাকিয়ে দিলখোলা গলায় বলতে লাগল 'সে তুমি যাই বল, মানুষ হিসেবে, একজন সিনেমা ডিরেক্টর হিসেবে আমি খুব খারাপ নই। সত্যজিত রায় মৃণাল সেন তপন সিংহ—এঁদের মত আমি বিখ্যাত আঁতেল চিত্র পরিচালক না হলেও, অন্তত কয়েকটা ছবি আমার খুব ভাল হয়েছে। সাধারণ পরিচালকদের চেয়েও আমার মাথায় গ্রে

ম্যাটার একটু বেশী পরিমাণেই আছে বলেই আমি মনে করি। নাম বললে চিনবে না, এমন অনেক, ভুঁইফোঁড়, চিত্র পরিচালক হয়ে এ লাইনে নেমেছে, যারা তদ্বির তদারক করে গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে ছবি তোলার জন্যে মোটা টাকা লোন নিচ্ছে। তারা জীবনেও কখনো চিত্রনাট্য লেখেনি। কেমন করে লেখে, তাও জানে না। ক্যামেরার অবস্থান সম্বন্ধেও কোন ধারণা নেই। কী অ্যাঙ্গেলে ছবি নেওয়া হবে, পাত্রপাত্রীরা কিভাবে কোথায় দাঁড়াবে, পরিবেশ পরিস্থিতি কেমন হবে, তাও তারা ভাল করে জানে না।'

জবা হেসে হেসে বললো ; 'আপনার তুলনাই হয়না দেখছি!'

চ্যাটার্জী গ্লাসের তরল পদার্থে জোরে চুমুক দিয়ে, ঢোক গিলে বললো ; তোমার কথা মিথ্যে নয়। আমি যে ইউনিট গড়েছি, তা পারফেক্টও বলা যায়। হ্যাঁ, তবে এটাও ঠিক, শুধু নাম কেনার জন্যে আমি আর্ট ফিল্ম করিনা। টাকা রোজগার করার উদ্দেশ্যও আমার থাকে। প্রডিউসারের কাছ থেকে যে সব টাকা পয়সা আমি পাই, নিজের সুখের জন্যে সে টাকা আমি খরচ করে উড়িয়ে দেই না। আর্টিস্ট, টেক্‌নিশিয়ানরাও যাতে কিছু কিছু পায়, সে ব্যবস্থাও সব সময় করে থাকি। যাকে দিয়ে স্ক্রিন প্লে লেখাই, তাকেও পুরো টাকা দিয়ে থাকি। যে লেখক আমার চিত্রনাট্যের ডায়ালগ লেখে, তাকেও আমি তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করি না। অর্থাৎ, এক কথায় পরিচালক হিসেবেও আমি একজন পারফেক্‌ট্‌ জেণ্টেলম্যান, বুঝলে জবা? তা তুমি স্বীকার কর, চাই নাই কর।'

'আমার স্বীকার অস্বীকারে আপনার কী যায় আসে বলুনতো?' জবা এবার মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল ; অনেক লেক্‌চার দিয়েছেন। এবার থামুন দেখি। আমার মাথা ধরে গেল। বাব্‌বাঃ।'

সংসারে কত রকম মানুষই না আছে।

অবিবাহিত, বিবাহিত, বিপত্নীক কিশোর যুবক বৃদ্ধ! সভ্য শিক্ষিত ওপরতলার মানুষ। ঘর সংসার স্ত্রী ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনি। কত সুনাম খ্যাতি প্রতিপত্তি। টাকা পয়সা ঘর বাড়ি গাড়ি।

অবদমিত বিকৃত বাসনা চরিতার্থের জন্যে সেই মানুষগুলোই কী ভীষণ উন্মত্ত হয়ে ওঠে। পশুর অধম, অস্বাভাবিক মানুষ হয়ে ওঠে।

শুধু কামনা বাসনা লালসা—আর প্রমত্ততা—

না, ভালবাসা নয়। মায়া মমতা শ্রদ্ধা প্রীতি বন্ধুত্ব নয়—

এসব কিছুই পাওয়া যায় না এদের কাছে।

জবা এদের মধ্যে সেই একজনকে খোঁজে।

যদি কেউ কখনো সব জেনে-শুনেও শুধু ভালবেসে তাকে তার হাত ধরে এই নরক থেকে টেনে নিয়ে যায় স্বর্গের দিকে।

এমন মানুষের দেখা যে একেবারেই পাওয়া যায় না, তা নয়। অন্ধকার মেঘে বিদ্যুতের বিদারণ রেখার মত মাঝে মাঝে দু' একজন জবার জীবন ছুঁয়ে চলে যায়। আশায় আনন্দে সূর্যমুখীর মত ঝলমল করে ওঠে জবা।

মনে হয়, বাঁচলাম—এতদিনে নরক থেকে আমার মুক্তি হল। এবার স্বর্গবাস। নাই বা হল সুখের স্বর্গ, ঐশ্বর্যের স্বর্গ পুণ্যের স্বর্গ তো বটে।

এমনই একজন মানুষ হঠাৎ তার জীবনে এসেছিল।

প্রফেসর মণিমোহন রায়। বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু বছর তিনেক বাদে ছেলে হতে গিয়ে বৌ মারা গেছে। কলকাতা থেকে বহু দূরে কোন এক মফস্বল শহরের কলেজে অধ্যাপনা করেন। একটু বয়স হয়েছে। কিন্তু চেহারাটি সুদর্শন। কলকাতায় এসেছিলেন কি কাজে। স্ত্রীর শোকে নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণায় জর্জরিত উদভ্রান্ত। বন্ধুর বাড়িতেই উঠেছিলেন।

পুরনো সহপাঠী বন্ধু ও'র অবস্থা দেখে দুঃখিত হয়ে একদিন চরিত্রবান শিক্ষিত প্রফেসারকে জবার কাছে নিয়ে এলেন।

তারপর, জবার সঙ্গে আলাপ পরিচয়, মেলামেশার দিন দু'তিন পরই দেখা গেল, ভালমানুষ অধ্যাপক জবার রূপে, কথাবার্তায় একেবারেই মুগ্ধ হয়ে মৃত স্ত্রীকেই বোধহয় ভুলতে বসেছেন।

মণিমোহন জবাকে বলেছিলেন, 'আমি তোমাকে ভালবাসি। না, হেসো না অমন করে। আমি তোমার শরীর এখনো স্পর্শ করিনি। তুমি যদি মনে করে থাক যে আমার ভালবাসা শুধু তোমার শরীরের সৌন্দর্যের জন্যেই, তাহলে ভুল করবে জবা। ভালবাসা বলতে শুধু একটি বস্তুই বোঝায় না।'

হাসিটাকে পুরোপুরি চাপতে না পেরে জবা ঠোঁটে ঠোঁট টিপে বলেছিল,

'আপনার মত কথা সবাই বলে না। তবে একেবারে যে শুনিনি একথাও ঠিক নয়। ওই ধরণের ঝাপসা ঝাপসা কথা দু-একজন মানুষ মাঝে মাঝে বলে বটে।'

প্রফেসর আহত হয়েছিলেন, 'তাদের সঙ্গেও আমার তুলনা তুমি কোর না জবা। সবাই তোমাকে যে ভাবে চায়, বিশ্বাস কর সে ভাবে আমি তোমাকে চাই না।'

'সবাই আমাকে যে ভাবে চায়, সে ভাবে আপনি আমাকে চান না? তবে কেমন ভাবে চান?'

এখন জবার মুখে হাসির বদলে গাম্ভীর্য। কণ্ঠস্বর পাথরের সঙ্গে পাথর ঘষার মত নীরস।

'সবার সঙ্গে ভাগাভাগি করে চাই না। সম্পূর্ণ নিজস্ব করে পেতে চাই। শুধু আমার—শুধু আমার ভালবাসার বাগানে তুমি একটা সুন্দর ফুল হয়ে ফুটে থাকবে। তুমি শুধু আমার—হবে।'

'কিন্তু তা কেমন করে হবে?'

'আমি তোমাকে বিয়ে করব।'

জবার রক্তে দোলা লাগে। জবার বুকের মধ্যে এক অনাস্বাদিত সুখ রসের দ্বারা আলোকিত হয়ে ওঠে। ভাল লাগার আবেশে চোখের দৃষ্টিতে কণ্ঠস্বরে ঘোর লাগে। 'কিন্তু বিয়ে করার পর যদি আপনার সব মোহ কেটে যায়? তখন যদি আর ভালবাসতে না পারেন? আমি তো ভাল মেয়ে নই—'

'জবা, তুমি ভাল কি মন্দ আমার জানবার প্রয়োজন নেই। তুমি ভাল মন্দ, পাপ পুণ্যের ওপরে। তুমি আমার অন্ধকারে আলো। আমার ধ্রুবতারা।'

'আপনি যেটাকে ভালবাসা বলছেন, হয়তো সেটা ভালবাসাই নয়। করুণা। সহানুভূতি। মোহ। পরে আপনাকে অনুতাপ করতে হতে পারে। আজ যা ভাল করে বুঝতে পারছেন না, বিয়ের পর—'

'বার বার একথা বলো না জবা। কোন পাপ তুমি কর নি। আর যদি করেই থাক, বাধ্য হয়ে করেছ। এ জীবনটা শুধু পুণ্য করবার জায়গা নয়। তার চেয়ে অনেক বড়। জীবনের ব্যাপ্তি সীমাহীন। অনন্ত

অসীম। তোমার কাছ থেকে আমি অনেক শান্তি পেয়েছি। ভালবাসা পেয়েছি। তার বদলে তোমারও আমার কাছে অনেক কিছু পাওয়ার অধিকার আছে। আমাকে ভালবাসার অধিকার, আমার ভালবাসা পাওয়ার অধিকার, আমাকে সম্পূর্ণ করে পাওয়ার অধিকার, আমার স্ত্রী হবার অধিকার—আমাকে তোমার স্বামী হতে দেবার অধিকার····'

এমন অনেক অনেক অনেক কথা—টুকরো টুকরো চূর্ণ চূর্ণ কথা বলেছিলেন জবাকে মণিমোহন রায়। জবার মুখের দিকে তাকিয়ে আধ-জাগা আধ-ঘুমন্ত মানুষের মত। যে সমস্ত কথা জবা কিছু বুঝতে পেরে-ছিল, অনেক কিছুই বুঝতে পারেনি।

কিন্তু বিশ্বাস করেছিল। বিশ্বাস করার কারণ ঘটেছিল। বন্ধকপাট ঘরের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির অনুপস্থিতিতেও প্রফেসর এতটুকু সংযম হারান নি। এতটুকু অশোভন অশিষ্ট আচরণ করেন নি। অন্য পুরুষদের মত ছিন্নবিচ্ছিন্ন করতে চাননি, ঝাঁপিয়ে পড়ে গ্রাস করতে চাননি জবাকে।

গল্প করেছেন। বই পড়ে শুনিয়েছেন। কবিতা আবৃত্তি করেছেন। জবা কিছু বুঝেছে। বেশী কিছু বোঝেনি। শুধু তার সমস্ত সত্তা তন্ময়তার এক অতলস্পর্শ গভীরে বিচরণ করেছে।

দুজোড়া চোখের অপলক দৃষ্টি-বিনিময় হয়েছে। মণিমোহনের হাতের মুঠোর মধ্যে জবার হাত, মণিমোহনের মুখের কাছে জবার মুখ, তবু আলিঙ্গনে নিষ্পিষ্ট হয়নি, অধরের স্পর্শে অধর মধুর রসে পীড়িত হয়ে ওঠেনি।

তাই জবা বিশ্বাস করেছিল। 'এখন নয়, বিয়ের পর তোমাকে সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করব। স্বামী যেমন গ্রহণ করে তার স্ত্রীকে। আমার জন্যে তুমি প্রস্তুত হও ততদিন। তোমার জন্যে আমিও প্রস্তুত হয়ে বসে থাকব। ভালবাসি ভালবাসি—এই কথাটা শুধু মুখস্ত বুলির মত বলে গেলেই হয় না। ভালবাসারও একটা প্রস্তুতি থাকা চাই। সময় চাই। যে ক'টা দিন আমাদের দুজনের বিয়ে না হয়, সে ক'টা দিন আমরা দুজনে দুজনের জন্যে অপেক্ষা করব। জবা, তোমার ভালবাসা আমি চাই, কিন্তু তার চেয়েও, সবচেয়ে আগে চাই আমার প্রতি তোমার বিশ্বাস। বিশ্বাস এলেই তার পেছনে ভালবাসা আসবেই।'

হ্যাঁ, সেই পরমতম বিশ্বাস করেছিল জবা মণিমোহনকে। মণিমোহনের চোখে মুখে কণ্ঠস্বরে সমস্ত অস্তিত্বে সেই বিশ্বাস যেন তার ভালবাসার মতই জড়িয়ে ছড়িয়ে ছিল।

তারপর একদিন মণিমোহন তার কর্মস্থলে সেই মফস্বল শহরে ফিরে গেল। মাঝখানে চৈত্রমাস ছিল। বৈশাখে বিয়ে হবে। 'তুমি ভেবো না জবা, আমি সেখানে গিয়েই তোমাকে সব জানিয়ে চিঠি লিখব। দেখতে দেখতে একমাস কেটে যাবে। তারপর—'

দেখতে দেখতে একমাস কেটে গেল। কিন্তু চিঠি এল না।

এক চৈত্র গিয়ে আর এক চৈত্র ফিরে এল। কিন্তু জবার জীবনে শুভ বৈশাখ মাস ফিরে এল না। দিনের পর দিন কেটে গেল, রাতের পর রাত কেটে গেল।

কিন্তু দুহাত বাড়িয়ে জবাকে কেউ এই অন্ধকার নরক থেকে আলোর স্বর্গে তুলে নিতে এল না।

জবার জীবনে অনেক পুরুষের মিছিলে মণিমোহন একটা অপমৃত ছায়াশরীর নিয়ে ওর মনের মধ্যে বেঁচে রইল।

বেঁচে রইল পুরুষ বলে নয়। বিশ্বাসঘাতক কাপুরুষ বলে। বঞ্চক প্রতারক বলে। মিথ্যাচারী কপট পুরুষ বলে।

জবার এই বাসনার কথা ওরা সবাই জানে। হেনা টগর পারুলরা। এই কামনা বাসনার উত্তরঙ্গ উচ্ছ্বাস ওদের আলোড়িত করে তোলে। এই বিস্বাদ জীবন থেকে মুক্তি চায় ওরাও। কোন কোন বিনিদ্র রজনীতে হারানো বাপ মা, ভাই-বোন, কারু কারু স্বামী সংসারের সমস্ত করুণ মধুর স্মৃতিগুলি ওদের দুচোখে জলের ধারা বইয়ে দেয়।

কিন্তু সে দুঃখ, সেই স্মৃতির বেদনার্ত যন্ত্রণা সাময়িক। আবার ওরা সব ভুলে বর্তমান জীবনকেই আঁকড়ে ধরে বসে থাকে। কেননা ওরা জানে, ফিরে যাবার উপায় নেই। আর কোনক্রমে ফিরেও যদি যায়, তবে সেখানে ওদের জন্যে এতটুকু জায়গা নেই। আশ্রয়ও নয়।

দরজা খোলা থাকলেও তাই ওরা ডানা-কাটা পাখির মত খাঁচার

ভেতরে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে। সবার মত অতৃপ্তি অশান্তি তাই ওদের অস্থির করে তোলে না। যদি কখনো তোলেও, তবে সে অস্থিরতা অশান্তি সাময়িক।

জবাকে ওরা মাঝে মাঝে সান্তনা দেয়, 'তোর বিয়ে হবেই। দেখিস। কত নামকরা খেমটাউলি, সিনেমার নটি, থিয়েটারের মেয়েদের কত বড় বড় বিয়ে হয়ে গেল। তুই তো ভাল ঘরের মেয়ে। তোর অত রূপ অত গুণ। সব ক'টা পুরুষই তোর জন্যে পাগল।'

'সব শেয়ানা পাগল।' মুখ ভেংচে জবা তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয়, 'এ দিকে পারে তো আমাকে গিলে খায়। কিন্তু বিয়ের নাম করলেই খাবি খেতে শুরু করে। পুরুষ গণ্ডায় গণ্ডায় জোটে হেনা, কিন্তু স্বামী জোটানো ভারী কঠিন।'

কিন্তু যত কঠিন হোক, যত অসম্ভবই হোক না কেন, জবার একান্ত কামনা বাসনা পূর্ণ হল।

জবার কপালে সত্য সত্যই একজন মোটামুটি শিক্ষিত ভদ্র স্বামী জুটল। বহুবল্লভা বৃত্তির দায় থেকে যে মানুষটি তাকে উদ্ধার করে সহধর্মিনীর আসনে বসাল, সেই মানুষটিই ভবেন ভট্টাচার্য।

সব মানুষের মত ভবেনেরও একটা ইতিহাস আছে বইকি।

হুগলির কোন এক ডুবে যাওয়া, ভেঙে চুরে হারিয়ে যাওয়া জমিদার-বাড়ির সম্পর্কে লতায় পাতায় দূর-সম্পর্কের বংশধর।

ভেঙে-চুরে পোড়-বাড়ি হয়ে যাবার আগে যখন সেকেলে মোটা মোটা থাম ভারী ভারী দেয়াল দিয়ে তৈরী জমিদার-বাড়িটা মোটামুটি দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় ছিল, ততদিন পর্যন্ত অন্দর-মহল বার-মহলে ঝাড়-লণ্ঠনের বাহার ছিল। অন্ধকার অন্ধকার চওড়া চওড়া সিঁড়িতে নরম কার্পেট পাতা থাকত। চাকর-দাসীরা কাজে অকাজে ভেতর-মহল বার-মহলে ঘোরাফেরা করত। বাড়ির বাড়ির বাবুমশায় লক্ষ্ণৌ আর জৌনপুরী দামী আতরের গন্ধ ছড়িয়ে রূপোর বাটা থেকে পান খেতে খেতে সাটিনের ঝালর দেয়া নরম তাকিয়ায় হেলান দিয়ে গেলাসে চুমুক দিতেন। ঢুলু ঢুলু চোখে বাঈজীদের নাচ দেখতেন।

ভবেনের পূর্বপুরুষদের এই সমস্ত জমিদারসুলভ স্বাভাবিক কার্যকলাপ ভবেন কিছুই চোখে দেখেনি। তবে গল্প শুনেছে। অনেক বাড়ানো, সত্যের সঙ্গে বেশীর ভাগ মিথ্যের মিশেল দিয়ে সে-সব গল্প তৈরী। নিজেকে এই বংশের উত্তর পুরুষ ভেবে গর্বে ওর বুক ফুলে উঠেছে।

ও শুধু জ্ঞান হবার পর দেখেছে ভাঙা কাঁচের ঝাড়-লণ্ঠন, ইট-সুরকী বারকরা মোটা থাম সিঁড়ির দেয়ালে কার্পেট বাঁধবার আংটা। অন্দর-মহলের ভাঙাচোরা দামী দামী খাট-পালঙ্ক। ভাঙা ভাঙা ঝাপসা ঝাপসা বড় বড় প্রমাণ-সাইজ আয়না—এই সব।

ভবেনের বাবা কৃপণ, বিষয়ী ও বুদ্ধিমান মানুষ। সময় থাকতে থাকতে, সুযোগ সুবিধা বুঝে নিজের পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিয়ে, জমিদার-বাড়ির ক্ষীণ সম্পর্কের সুতো ছিঁড়ে কলকাতায় চলে আসেন। আসার আগে নিজের ভাগের সবটুকু সম্পত্তি বিক্রি করে বেশ মোটা টাকা হাতিয়েই চলে আসেন। সঙ্গে স্ত্রী ও একমাত্র সন্তান ভবেন। সঙ্গে আনা টাকাটা ব্যাংকের দৌলতে সুদে-আসলে যখন বেশ একটা মোটা-সোটা ধারণ আকার করেছিল, তখন তাঁরা কয়েক বছরের মধ্যেই পর পর স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই মারা গিয়েছিলেন। ছেলেকে অবশ্য অনাথ অসহায় ফেলে রেখে যাননি। তাঁদের মহাপ্রস্থানের আগেই ভবেনের বৌয়ের আগমন হয়েছিল। দেখে শুনে বেশ বড়লোকের ঘরেই তাঁরা ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন। বৌ দেখতে একেবারেই ভাল ছিল না বলে তাঁরা বৌয়ের সর্বাঙ্গ সোনায় মুড়ে এনেছিলেন। সেটা বৌয়ের বড়লোক বাপই যৌতুক দিয়েছিল, একথা বলাই বাহুল্য।

তা ভবেনের কপাল ভাল। কেলে-কুচ্ছিত বৌ তার একেবারেই পচ্ছন্দ হয় নি। বাবা মায়ের মৃত্যুর পরের বছরই ভবেনের বৌ মারা গেল। কী একটা কঠিন অসুখে।

কৃপণ, বিষয়ী বাপের স্বভাব ভবেন পুরোপুরির চেয়েও কিছুটা বেশী পেয়েছিল। বৌয়ের গায়ের প্রচুর গয়নাগাঁটি, ব্যাংকের প্রচুর টাকাকড়ির মালিক হয়েও বৌয়ের জন্যে মনমরা হয়ে পড়ল। হা-হুতাশ করল কম নয়। দু একজন উঠতি বয়সের দিলদার বন্ধু সুযোগ বুঝে ঘন ঘন আসা-যাওয়া শুরু করল ভবেনের কাছে। স্ত্রীবিয়োগবিধুর ভবেনের শোক দূরে

করার, মন ভাল রাখার ব্যবস্থা তারাই করল।

উঠতি বয়সের বদ অভ্যাসটা মাঝে বিয়ে হবার পর চাপা পড়ে গিয়েছিল। সেটা আবার সঙ্গদোষে স্বভাবদোষে বেশ ভাল করেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। আগে আগে লুকিয়ে-চুরিয়ে যেত। অভিভাবক-হীন, স্ত্রীহীন হবার পর বেশ নিশ্চিন্ত মনেই ভবেন বন্ধুদের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ পাড়ায় বিশেষ বিশেষ মেয়েমানুষদের কাছে নিয়মিত আসা-যাওয়া শুরু করল।

একজন বড়লোক বন্ধুর কাছ থেকেই জবার কথাটা শুনেছিল ভবেন। তার চেহারা, নাচ-গানের কথা। বন্ধুর দৌলতে তাকে একদিন নিজের দেখার সুযোগও হল। আর দেখার পরই ওর মনে হয়েছিল, যেমন করেই হোক না কেন, যত টাকাই লাগুক না কেন ওই সুন্দরী মেয়েটিকে না পেলে তার জীবনই বৃথা।

টাকা-পয়সার অভাব ছিল না। তাই জবাকে কাছে পাওয়ার সৌভাগ্য হল। চোখে দেখেই আধমরা হয়েছিল। কাছে পেয়েই একেবারে মরল। কথা বলতে গিয়ে চোখ মুখ লাল করে তোতলাতে শুরু করল।

মাত্র একদিনেই—প্রথম দিনেই জবার সঙ্গে সাহচর্যে ভবেন উন্মত্ত হয়ে উঠল। যথার্থ মনে হল, এতদিন যেসব মেয়েদের কাছে ও গেছে, জবার তুলনায় তারা কিছুই নয়। জবা ভদ্রঘরের মেয়ে। জবার রূপ-গুণ শিক্ষা-দীক্ষাও আছে। ভাল নাচ-গানও জানে। চমৎকার কথা-বার্তা বলে। জবা যেন পাঁকে ফোটা পদ্মফুল। ভবেনের ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের জীবনে এমন অপূর্ব মেয়ে সে চোখেও দেখেনি।

আকাঙ্ক্ষা সেখানে সমুদ্রের মত সীমাহীন, বিন্দুতে সেখানে পিপাসার যন্ত্রণা বাড়ায়। জবার প্রতি এক ভয়ংকর আকর্ষণ ভবেনকে পাগল করে তুলল। জবাকে ও প্রত্যেকদিন কামনা করতে চাইল। কাছে পেতে চাইল। পুরোপুরি দখলের বাসনাটাও উঁকি-ঝুঁকি মারতে লাগল মনের মধ্যে।

কিন্তু সেদিকে অসুবিধা প্রচুর।

মালতী সেনের কড়া আইনে তাঁর মেয়েরা কারু কাছে রক্ষিতা হিসাবে, বাঁধা মেয়েমানুষ হিসেবে বেশীদিন থাকতে পারবে না। তাহলে তাকে

মালতী-নিবাস থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। অন্য মেয়ের বেলা এই আইন একটু শিথিল হলেও, জবার বেলা তিনি অত্যন্ত কঠোর। ঘণ্টা হিসেবে মোটা টাকার বাবুদের কাছেই জবা বাঁধা। কোন এক বাবুদের কাছে সে বেশীদিন যায় না। তার বায়নাও নেয় না দিনের পর দিন।

জবার জন্য ভবেন দুহাতে টাকা খরচ করতে লাগল।

নিরুপায় হয়ে, কয়েকদিন বাদ দিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে লাগল। কিন্তু তাতেও বিশেষ সুবিধা হল না। জবার সময়ের দাম অনেক। ওকে বেশীক্ষণ ধরে রাখা যায় না।

ওকে নিজস্ব করে পাওয়ার অন্য কোন উপায় না দেখে শেষপর্যন্ত ভবেন সরাসরি তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করল। যেমন তেমন বিয়ে নয়। হিন্দুমতে, পুরুত বামুন ডেকে। কালীঘাটে ঘর ভাড়া করে। শালগ্রাম-শিলা অগ্নিসাক্ষী করে। যেমন করে বিয়ে হয়েছিল মা-বাবার। জবার মা-বাবার।

জবা প্রথমে ভবনের প্রস্তাবে রাজী হয়নি। সরাসরি প্রত্যাখ্যানই করেছে। ভবেনকে তার খুব একটা দৃঢ় চরিত্রের শক্ত সমর্থ নির্ভরশীল মানুষ বলে মনে হয়নি। রূপমুগ্ধ মোহগ্রস্ত পুরুষ। আশার অতীত এক দুর্লভ বস্তুর সন্ধান পেয়ে তাকে করায়ত্ত করার বাসনায় হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে গেছে।

তাই জবা ওর বিয়ের প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

কিন্তু ভবেন অনেক কান্নাকাটি করে হাতে-পায়ে ধরে, ভবিষ্যতের অনেক সুখের স্বপ্ন দেখিয়ে ক্রমে ক্রমে ওর হৃদয়ের সেই মোক্ষম দুর্বল স্থানটি অধিকার করতে সক্ষম হয়েছিল।

ভবেনের প্রচুর টাকাকড়ি। আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। অভিভাবক বলতেও কেউ নেই। একটা মোটামুটি চাকরিও করে। জবাকে সে মাথার মণি করে রাখবে এতবড় আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও তাকে আরো কিছুদিন অপেক্ষা করে থাকতে হয়েছিল। জবারই উপদেশে। উপস্থিত কিছুকাল এই শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে বিয়ের পর। ভবেনের তাই বাইরে একটা চাকরি পাওয়া দরকার।

পাগলের মত চাকরির খোঁজ শুরু করে দিয়েছিল ভবেন। জবাকে

পাবার জন্যে। অনেক ধরাধরি করে, প্রচুর টাকা ঘুষ দিয়ে একটা পাওয়াও গেল। স্টেশন-মাস্টারের চাকরি। নতুন নতুন স্টেশনে ঘুরে বেড়াতে হবে। দু এক বছর অন্তর বদলি হতে হবে। প্রচুর অসুবিধা। মাইনে খুব বেশী নয়।

কিন্তু এই অসুবিধার চাকরি, বদলির চাকরি, তখন ওদের কাছে শাপে বর হবার মতই হয়েছিল। বিয়ের আর কোন বাধা ছিল না। চেনা-জানা বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে ওরা সুখে-শান্তিতে নির্বিঘ্নে সংসার করতে পারবে। কোন পরিচিত মুখ সেখানে তাদের বিড়ম্বিত করতে হানা দেবে না। তারা দুজনে দুজনকে নিয়েই থাকতে চায়। তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি সেখানে অবান্তর উপদ্রব মাত্র।

খবরটা শুনে হেনা, পারুল, টগর, মল্লিকা, জুঁই, চামেলি—সকলে অবাক হয়ে গেল। 'সত্যি সত্যি তোর বিয়ে হবে জবা? সত্যি তুই বর জোটাতে পেরেছিস?'

'সত্যি না তো কি মিথ্যে? মাসী যদি বিয়ে দেয় ভালই, নইলে আমরা দুজনে রেজেস্ট্রি করে বিয়ে করব।'

'কেমন করে জোটালি ভাই?' ছ'টি অসুখী অতৃপ্ত মনের যুবতী মেয়ে নিজের অবস্থা পরিস্থিতি পরিবেশ দুঃখ ভুলে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে জবাকে জড়িয়ে ধরল।

জবা ঠোঁটে ঠোঁট টিপে হাসল। 'জোটালাম আর কোথায়? নিজেই জুটে গেল।'

'সব জেনে-শুনে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে?' ঘা-খাওয়া, পোড়-খাওয়া মল্লিকা উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

'রাজী বলে রাজী? আমাকে বিয়ে করবে বলে কলকাতা ছেড়ে বাইরে চাকরি নিয়েছে। মস্ত বড় বংশের ছেলে। তায় ব্রাহ্মণ। আজ বললে আজই বিয়ে করে। কি বলব তোদের, বিয়ে করবার জন্যে মানুষটা একেবারে পাগল হয়ে উঠেছে। দেখতে শুনতেও সুন্দর। লেখাপড়াও জানে। মোটামুটি ভালই। তা ভাই, মা বলতেন, বড়মানুষের দাসী হওয়ার চেয়ে গরীব স্বামীর ঘরের রাণী হওয়া ঢের ঢের বেশী সুখের, শান্তির,

সম্মানের।' জবার মুখ আনন্দে অহঙ্কারে আত্মতৃপ্তিতে ঝলমল করে ওঠে।

জবার সুখে সুখী হেনাদের মুখগুলোতে তবু যেন এক শঙ্কার ছায়া থমথমে হয়ে ওঠে। 'মাসীকে বলেছিস? মাসী রাজী হবে তো?'

'মাসী রাজী না হল তো বয়েই গেল। আমি তো আর কচি খুকী নই। মাসীর খাইও না পরিও না, অত ভয় কিসের?'

মুখে যতই বলুক না, মনে মনে মাসীকে একটু সমীহ করে বইকি। হাজার হোক মা মারা যাবার পর থেকে মাসীই তো যত্ন-আত্তি করে এতকাল রেখেছে। সুযোগ-সুবিধা বুঝে জবা একসময় মালতী সেনকে তার মনের ইচ্ছের কথাটা বলল। ভবেনের পরিচয় দিয়ে, সে তাকে বিয়ে করতে চায়—কোন কথাই গোপন করল না।

'বিয়ের শখ হয়েছে! বলি ক'দিনের বিয়ে? দুদিন বাদে তোকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে। এত পুরুষ ঘাঁটলি তবু তোর বিয়ের শখ?' মালতী সেন রাগে আগুন হয়ে যা মুখে আসে তাই বলে জবাকে শুনিয়ে দিয়েছিলেন। চেঁচামেচি করেছিলেন। জবার রুচি প্রবৃত্তিকে যাচ্ছেতাই করেছিলেন। 'পোড়ার দশা আর কাকে বলে। শেষ পর্যন্ত ভট্চায্ বামুনকে তোর বিয়ে করার শখ হল? কত টাকা আছে ওর? ক'খানা বাড়ি? তোর রূপ দেখে ভুলেছে, বুঝলি। চোখের মোহ কেটে গেলে তখন আবার তোকে তাড়িয়ে দেবে।'

'তাড়িয়ে দিলে তোমার কাছেই ফিরে আসব মাসী।' জবা মাসীকে শান্ত করতে চেষ্টা করেছিল। 'তুমি ছাড়া আমার আপন বলতে আর কে আছে তাই বল? মা তো আমাকে তোমার হাতেই তুলে দিয়ে গেছেন। তাঁর শেষ ইচ্ছেটা পূর্ণ করার জন্যেই—'

জবার মায়ের শেষ ইচ্ছেটাকে নস্যাৎ করে দিয়ে মালতী সেন তেমনই ক্ষিপ্ত হয়ে চেঁচাতে লাগলেন, 'কত দেখলাম কত শুনলাম। তোদের মত বাবু-ধরা মেয়েদের কে আবার ক'দিন মাথায় করে রাখে? মধু ফুরালেই ব্যাস, অন্য ফুলে উড়ে যাবে। মাঝখান থেকে তুই মরবি। বাজারদর কমে যাবে। গরীব মানুষের বৌ হয়ে খাটতে খাটতে চেহারার বাঁধুনী ঢিলে হয়ে যাবে। আর চেহারা গেল তো রইল কি? তখন কানাখোঁড়া ভিখিরিও পুঁছবে না। বছর ঘোরার আগেই না যদি তোকে ফিরে আসতে হয়—

আমার নাম মিথ্যে। কত বড় অ্যারিস্টক্রাট ফ্যামিলির মেয়ে আমি, কত বড় বনেদী ঘরে আমার বিয়ে হয়েছিল, হাই ফ্যামিলি ছাড়া মিশিনি কখনো। দেখে শুনে জেনে হদ্দ হয়ে গেলাম, বুঝবি, মজা টের পাবি—।'

রাগে গর গর করতে করতে মিসেস সেন বেঁটে ছাতাটা আর কাগজপত্র ভরা ব্যাগটা নিয়ে খর খর করতে করতে মালতী-নিবাস ছেড়ে রাস্তায় নেমে গেলেন। যতই চেঁচান আর রাগ করুন না কেন, আসল কথাটা ভুললে তাঁর চলে না। এখন তাঁর অনেক কাজ। অনেক দায়িত্ব।

মালতী সেন তখনি মেজর মিত্রের বাড়ি, মিসেস করমচাঁদের বাড়ি, আরো 'হাই ফ্যামিলির' জানাশোনা মোটা চাঁদা-দেনেওলা বড়লোক মিসেসদের বাড়ি গিয়ে তাঁদের কাছে সবিস্তারে তাঁর কৃতিত্বের কথা বলে এলেন। একটি অধঃপতিতার আত্মাকে তিনি উদ্ধার করেছেন। প্রাণপণ চেষ্টার পর একটি সুপাত্র যোগাড় করেছেন। মালতী-নিবাসের, তাঁরই একটি সমাজচ্যুতা মেয়ের জন্যে যে মেয়েটি তার কুমারী জীবনের চরম কলঙ্কের জন্য তাঁর কাছে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। মালতী সেনের জীবন সার্থক, সেই মেয়ে আজ সুস্থ সমাজ-জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে।

মালতী সেনের এই নিঃশব্দ সমাজসেবা, নিপীড়িত সমাজচ্যুত মেয়েদের জন্যে এই দরদ সহানুভূতি ইত্যাদির মর্মস্পর্শী জ্বালাময়ী ভাষণে প্রত্যেকটি হৃদয়বতী মহিলাই অভিভূত হলেন। এবং শ্রীমতী মালতী সেনকে জবার বিয়ের দরুণ প্রত্যেকেই কিছু কিছু অর্থসাহায্য করতে বাধ্য হলেন, একথা বলাই বাহুল্য।

মুখে যাই বলুন, যত রাগই করুন না কেন, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল মাসীই জবার বিয়ের সব ব্যবস্থা করলেন। নিঃসন্তান, বন্ধ্যা রমণীর হৃদয়ের শূন্যতা জবা পূর্ণ করে রেখেছিল, তার মা মারা যাবার পর থেকেই। জবার মায়ের শেষ অনুরোধটা একেবারে মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন নি মালতী সেন। তাই বিয়ে শেষ হবার পর ওরা দুজনে চলে যাবার আগে সত্য সত্যই জবাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলেন মালতী সেন।

জবার নাম বদলে কল্যাণী নাম মাসীই দিয়েছিলেন।

গাড়িতে তুলে দিয়ে চোখের জল মুছে মাসী বললেন, 'তোর কপাল ভাল মণি, তোর মায়ের ইচ্ছে পূর্ণ হয়েছে। মনের মত, পছন্দ মত স্বামী পেলি। ভবেন সব জেনে শুনে তোকে বিয়ে করেছে। আমার আর কোন চিন্তা রইল না। তবু তোকে একটা কথা বলে দিচ্ছি। তোকে অনেক জায়গায় যেতে হবে। ভবেনের সঙ্গে এদেশ ওদেশ ঘুরতে হবে। কিন্তু খুব সাবধান বাছা! তুই একটা নাম-করা নাচিয়ে গাইয়ে সুন্দর মেয়ে ছিলি, এ লাইনে অনেকদিন আছিস, অনেক মানুষ তোকে চেনে জানে। এতদিন কোন ঝামেলা ছিল না। কিন্তু এখন তোর বিয়ে হয়ে গেল। ভদ্র পরিবারে মেলামেশা করতে হবে। ভবেনের বন্ধু-বান্ধবদের সামনে বেরুতে হবে। তোর এখানকার এই পরিচয় জানাজানি হয়ে গেলেই সর্বনাশ হয়ে যাবে। ভবেনের মাথা হেঁট হবে। তোকেও হয়তো ছেড়ে কথা কইবে না। পুরুষমানুষ বেশ্যা-বাড়ি যায়, মেয়েমানুষ নিয়ে স্ফূর্তি করে, তাতে তাদের কোন দোষ হয় না। কিন্তু বাজারের মেয়ে সাজ বদলে ভদ্দোর লোকের বউ সেজে ভদ্দোর লোকের সমাজে পরিবারে ঘর-সংসারে তাদেরই মত একজন হয়ে মেলামেশা করতে চাইলে, কেউ তাকে, আপনার বলে মেনেও নেয় না, ক্ষমাও করে না। একথা তুই যেন কখনো ভুলে যাসনি মণি।'

ভবেন চুপ করে জবার পাশে দাঁড়িয়েছিল। তাড়াতাড়ি মাসীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বলে উঠল, 'মিসেস সেন, আপনি সেজন্যে কিছু ভাববেন না। সে ভার আমার। জবার সব দায়িত্ব আমি নিয়েছি। আমি ওকে শিখিয়ে পড়িয়ে ঘরের বৌ করে রাখব বলেই বিয়ে করেছি। বাইরের পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করার ওর দরকারটাই বা হবে কেন বলুন? এবার থেকে ও ঘর সংসার নিয়েই থাকবে।'

বিষণ্ণ মুখে তবু মালতী সেন আবার বললেন, মণি, আর একটা কথা তোকে বলে রাখছি। আশীর্বাদ করি চিরদিন সুখে স্বচ্ছন্দে স্বামীর ঘর কর। ভগবান না করুন, তবু যদি কোনদিন তুই কোন বিপদে-আপদে পড়িস, আমাকে জানাবি। তোর মা তোর ভাল-মন্দের ভবিষ্যতের সব ভার আমার ওপরেই মরবার সময় দিয়ে গিয়েছিল। নিজের পেটের

মেয়ের চেয়েও বেশী ভালবেসে যত্ন করে তোকে আজ এত বড়টা করে তুলেছি। মনে রাখিস, তোর এই মাসীর বাড়ির দরজা চিরদিন তোর জন্যে খোলা থাকবে।'

মাথায় একমাথা সিঁদুর। এক-গা গয়না, নতুন লাল বেনারসী পরে মাথায় ঘোমটা টেনে নম্রনত কল্যাণী বধূটির মতই জবা ভবেনের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে মালতী-নিবাস ছেড়ে চলে গেল।

পেছনে পড়ে রইল আরো ছ'টি যুবতী মেয়ে। তাদের অতৃপ্ত আশা আকাঙ্খা নিয়ে, হতাশা-নিরাশা নিয়ে। চাপা ঈর্ষার জ্বালা নিয়ে।

জবাকে নিয়ে ট্যাক্সিটা অদৃশ্য হতে ওরা চোখের জল মুছে ওপরে চলে এল। জবার শূন্য ঘরে ঢুকে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল। 'বেঁচে গেল। ও যা চেয়েছিল তাই পেল। মনের মত ঘর বর সংসার। ওর মত ভাগ্য আমাদের মত মেয়েদের মধ্যে ক'জনের হয়? মালতী-নিবাস থেকে ও চিরদিনের মত মুক্তি পেল।'

জুঁইয়ের কান্না তখনো থামেনি। ও ফুঁপিয়ে উঠল, 'জবাদি এখানে আর আসবে না?'

'এখানে! আবার!' পারুল ঝলসে উঠল, 'কেন, এই নরকে পচে মরতে ও আবার আসবে কেন? সুখের স্বর্গ ছেড়ে?'

জবাদি আর আসবে না—জবাদিকে আর দেখতে পাবে না, এ কথা মনে হতেই জুঁই আবার কেঁদে ফেলল।

হেনা ধমকে উঠল, 'আ মর, কেঁদে ভাসাচ্ছিস কেন রে ছুঁড়ী? নাই বা এল ও এখানে। তবু তো জানব ও এই নরক থেকে নিত্যি নতুন পুরুষমানুষের বদখত অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পেয়ে ঘর-সংসার করছে, সুখে আছে।'

'আমাদের কোন সুখ নেই। আমাদের কোনদিনও সুখ হবে না। আমরা কখনো সুখী হব না।' টগর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

'আমাদের ভালবেসে সব দোষ ক্ষমা করে, সব জেনে-শুনে কোন মানুষ বিয়ে করবে না!' চামেলি আবার চোখে আঁচল চাপা দিল।

'আমরা কেউ জবার মত নই। আমরা কেউ কল্যাণী হতে পারব না। মল্লিকা উদাস চোখে খোলা জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল।

অদ্ভুত একটা বিষণ্ণতায় আপ্লুত হয়ে ভাগাহত নির্যাতিত নিপীড়িত ক'টি মেয়ে জবার শূন্য ঘরে নিঃশব্দে বসে রইল।

তারপর!

তারপর কেমন করে কী ভাবে কল্যাণীর জীবনের ছ'টা বছর কেটে গেল, ওরা কেউ সে খবর জানতেও পারল না।

বিয়ের প্রথম প্রথম ভবেন ওকে ভালবাসায় আদরে আপ্লুত করে রেখেছিল। ওকে দিনরাত অমন করে একলা ঘরে ফেলে রেখে বাইরে বাইরে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বেশীক্ষণ আড্ডাও মারত না।

কিন্তু পুরুষের মোহ কেটে যেতে খুব বেশীদিন সময় লাগল না। অপ্রাপ্য দুর্মূল্য বস্তু অনায়াস করতলগত হলে বুঝি তার দাম একেবারেই কমে যায়। বাক্সবন্দী করে তালাচাবি দিয়ে রাখব, সময় মত একটু নাড়াচড়া করে দেখব। ব্যস্, আর কি চাই? এই মনোবৃত্তি নিয়েই বুঝি ক্রমশঃ ভবেন কল্যাণীর কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে, তার একান্ত আনন্দের বাইরের জগতে বেরিয়ে চলে গেল। আর আত্মসর্বস্ব স্বার্থপরের মত নিজের প্রত্যেকটি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ভার কাজকর্মের ভার সংসারের সব দায়-দায়িত্ব কল্যাণীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তাকে ঘরবন্দী করে সহস্র কাজে ডুবিয়ে রাখল।

মাসীকে যা মুখে বলে এসেছিল, ব্যবহারে কাজেও তাই করল। 'ও ঘরসংসার করবে এবার থেকে। ঘরের বৌ হয়ে ঘরে থাকবে। বাইরে বেরুবার, পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করার কি দরকার ওর?'

কিন্তু মেলামেশার চেষ্টা না করলেও একেবারে নির্লিপ্ত হয়েও থাকা যায় না। বড়ডিহি স্টেশনে থাকতে তার পাশের কোয়ার্টারের বৌটির সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়েছিল। যদিও ভবেন ওকে বার বার বারণ করে দিয়েছিল, সাবধান করে দিয়েছিল। কল্যাণী যেন বেশী মাখামাখি না করে। বেশী অন্তরঙ্গতা না করে।

বৌটির নাম সরলা। বছর দেড়েক মাত্র বিয়ে হয়েছে। স্বামী স্ত্রী দুজনে থাকে। বয়সে কল্যাণীর চেয়ে বছর দু'তিনের ছোটই হবে। গ্রামের মেয়ে। সহজ সরল সাধারণ।

কল্যাণীরা বদলি হয়ে বড়ডিহিতে আসতে না আসতেই সরলা যেচে ওদের কোয়ার্টারে গিয়ে ওর সঙ্গে আলাপ করেছিল। পর পর ক'দিন দুপুরবেলা ভবেনের অনুপস্থিতিতে কল্যাণীর ঘরে জমিয়ে বসে গল্প করেছিল। তার শ্বশুরবাড়ি বাপের বাড়ির গল্প। বাবা মা ভাই বোন বড়দা দেওর ননদ শ্বশুর শাশুড়ীর কথা, তাঁদের সকলের জন্যে ওর মন কেমন করার কথা বলেছিল বিষণ্ণ মুখে।

তারপরই বলেছিল, 'অবিশ্যি বেশীদিন আমাকে একা একা থাকতে হবে না।'

'তোমার শাশুড়ী দেওর ননদরা আসবেন বুঝি ?'

'দূর দূর, তাঁরা কেন এই জংলী দেশে আসতে যাবেন ? আর এলেও ক'দিন বা থাকবেন বল ? দেওর ননদ ভাইবোনদের ইস্কুল-কলেজ আছে, কে বেশীদিন থাকে ভাই ?'

'তবে ?'

'বুঝতে পারলে না ?' সরলা মুখ টিপে রহস্যময় হাসি হাসল, 'আমি একা একা থাকতে পারছি না, ভাল লাগছে না বলে উনি আমার জন্যে একজন পারমানেণ্ট মেম্বার আনবার ব্যবস্থা করেছেন।'

'পারমানেণ্ট মেম্বার! ওঃ বুঝেছি। তোমার বুঝি খোকা হবে, তাই না ?'

লজ্জিত অথচ খুশী খুশী মুখে সরলা ঘাড় নাড়ল। 'হ্যাঁ ভাই। তবে এত তাড়াতাড়ি বাচ্চাকাচ্চা হবার ইচ্ছে আমার ছিল না। এই তো বছর খানেকের ওপর বিয়ে হয়েছে—এরি মধ্যে—তা কি করব বল ? উনি শুনলেন না—'

জবাও খুশী হল। 'বাঃ, খুব সুখবর। তা ভালই তো। এমন তাড়াতাড়ি আর কোথায় ? তোমার উনি ঠিক কাজই করেছেন। বাচ্চা হলে তোমার আর একা একা মনে হবে না।'

সরলা হেসে ফেলল, 'পরের বেলা বেশ উপদেশটি দিচ্ছ ভাই তুমি। আর নিজের বেলা ? তোমার তো আমার অনেক আগে বিয়ে হয়েছে। তোমার কেন বাচ্চা হচ্ছে না ?'

মুখের হাসিটাকে বজায় রেখে জবা উত্তর দিল, 'কী করব ভাই বল ?

এ তো আর মানুষের হাত নয়। ভগবান না দিলে—'

'ঈস্ স্, ভগবান না দিলে!' সরলা চোখ মটকে একটা গভীর ঈশারা করল। 'ভগবানের দোহাই দিচ্ছ কেন ভাই কল্যাণী? ইচ্ছে করেই তোমরা বাচ্চা হওয়াচ্ছ না। আমি সব জানি। তোমার কর্তা আমার কর্তার কাছে বলেছেন। তুমি নাকি এখন ছেলেপুলে চাও না, তাই তোমাদের বাচ্চা হচ্ছে না। বাচ্চা হলে তোমার সুখের ঘাটতি পড়বে—'

জবা স্তম্ভিত স্তব্ধ—হতবাক্!

সরলার এই কথাটার জবাব দেবার মত ভাষা তৎক্ষণাৎ তার জোগাল না।

জবা ছেলেপুলে চায় না বলেই তার কিছু হচ্ছে না।

এত বড় মিথ্যে কথাটা ভবেন কেমন করে কোন মুখে সরলার স্বামীর কাছে মুখ ফুটে বলতে পারল?

মাসখানেক পরে হঠাৎ সরলা এক সময় গল্প করতে করতে বলে ফেলল, 'এই তো ভাই তুমি আমার সঙ্গে কত গল্পগুজব করছ, তবে শুনলাম তুমি নাকি লোকজনের সাথে মেলামেশা পছন্দ কর না? বেশী কথা কইলে তোমার নাকি অসুখ হয়, হিস্টিরিয়া হয়?'

সব বুঝেও জবা হেসে বলল, 'মনের মত বৌ হয়নি বলে আমার কর্তা মনের দুঃখে বাইরের লোকেদের কাছে ওই সব কথা বলে বেড়ায়। তোমার মত লক্ষ্মী মেয়ে আমি তো নই। দেখছ না, যেমন রূপ, তেমনি গুণ।'

'রূপ—গুণ! তুমি মনের মত বৌ হওনি!' সরলা অবাক বিস্ময়ে বড় বড় চোখে জবাব দিয়েছিল, 'ঠাট্টা করছ বুঝি ভাই? তোমার মত সুন্দর মেয়ে আমি সত্যি কোথাও দেখিনি। আচ্ছা, তুমি তো কখনো তোমার শ্বশুরবাড়ি বাপের বাড়ির গল্প আমার কাছে কর না? তোমার বাপের বাড়ি কোথায়?'

'বাপের বাড়ি? সে এলাহাবাদ ছাড়িয়ে আরো উত্তরে জাসিমাবাদে ছিল। কিন্তু বাবা-মা কেউ নেই। সেখানকার সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক উঠে গেছে।' মুখস্থ করা কথাগুলো বলতে কল্যাণীর এক মুহূর্তও দেরী হয় না।

'ছোট ভাই বোন? দাদা দিদি?

'কেউ নেই। বাবা-মায়ের আমি এক মেয়ে।'

'আহা তোমার তাহলে ভারী দুঃখু ভাই।' গভীর আন্তরিক সহানুভূতি সরলার কণ্ঠস্বরে। 'তা শ্বশুর শাশুড়ী? দেওর ননদ ভাসুর জা?'

'আমার পোড়া কপাল ভাই। সেদিকেও কেউ নেই। একেবারে রাজযোটক। উনিও একমাত্র ছেলে। ওমা—উনুনটা জ্বলে যাচ্ছে, তুমি একটু বোসো ভাই, আমি চারটি কয়লা ঢেলে দিয়ে আসি। আজ আবার উনি বলে গেছেন হিং-এর কচুরী খাবার ইচ্ছে হয়েছে—'

অপ্রিয় প্রসঙ্গটা ওইখানেই চাপা দেবার জন্যে কল্যাণী তাড়াতাড়ি সরলাকে ঘরে বসিয়ে রেখে রান্নাঘরের দিকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

মাঝে মাঝে সরলার ভালবাসার টানে ওদের কোয়ার্টারে যেত কল্যাণী। কিন্তু সে সুখটুকুও বেশীদিন রইল না। হঠাৎ একদিন সরলার কলকাতার বড়দা এসে হাজির হল। ভবেনের সঙ্গে আলাপ হল। সরলার সঙ্গে ভবেনের কোয়ার্টারে এসে কল্যাণীর সঙ্গে আলাপ করে চা খেয়ে গেল। তারপর থেকেই 'আপনাকে যেন খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে, কোথাও যেন দেখেছি' এই কথা বলে কল্যাণীর ওপর এত বেশী মনোযোগ দেওয়া শুরু করল যে ভবেন রেগে আগুন হয়ে উঠল। কল্যাণীর যদিও এ ব্যাপারে কোন দোষ ছিল না, তবু তার সঙ্গে এমন ঝগড়া শুরু করল যে কল্যাণী একেবারেই ওদের সঙ্গে মেলামেশা বর্জন করল।

অবশ্য তার কিছুদিনের মধ্যেই সরলা তার দাদার সঙ্গে ছেলে হতে বাপের বাড়ি চলে গেল। ছেলে কোলে নিয়ে সে যখন আবার বড়াডিহি স্টেশনে ফিরে এল, তখন কল্যাণীরা অন্য জায়গায় বদলি হয়ে চলে গেছে।

কিন্তু যেখানেই যাক না কেন, কল্যাণীর সেই একই অবস্থা। সেই ঘর সংসার। সমস্ত দিন কাজ আর কাজ। খাঁচায় বন্দী পাখির মত অসহায় পাখা ঝাপটানো। অথচ ভবেন স্বাধীন। ওর সঙ্গী-সাথীর বন্ধুবান্ধবের অভাব হয় না। ওর চরিত্র খারাপ ছিল, চিৎপুর রামবাগানের গলির অনেক মেয়েমানুষের কাছে ওর যাতায়াত ছিল, একথা জানাজানি হয়ে গেলেও সেটা মস্ত একটা কিছু দোষণীয় অথবা অপরাধের ব্যাপার বলেও মনে করে না। কিন্তু ওই লাইনের একটা খারাপ নষ্ট চরিত্রের মেয়েকে ও বিয়ে করে এনে ভদ্রসমাজে স্ত্রী বলে চালাচ্ছে—এই কথাটা কোন

মতেই প্রকাশযোগ্য নয়। ভবেনের স্ত্রীর দরকার ছিল না। দরকার ছিল একটা মেয়েমানুষের। সেবাদাসীর। ঝি অথবা রাঁধুনীর।

কল্যাণীর নিঃসঙ্গ অবসাদময় জীবন কেমন ভাবে কাটছে সেদিকে নজর দেবার কোন প্রয়োজনই ওর নেই। মন-কষাকষি হলে অথবা তুচ্ছ কারণে ঝগড়াঝাটি হলেও কল্যাণীকে কঠিন ভাবে আজকাল স্মরণ করিয়ে দেয় কল্যাণী কি। নরক থেকে তুলে এনে ভবেন ওকে স্বর্গবাসিনী করেছে—একথা যেন কল্যাণী ভুলে না যায়।

এই রকম একটা স্থূলরুচি আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর মানুষের সঙ্গে ওকে সারাজীবন কাটাতে হবে! এই ভাবে! এই অন্ধকার কূপের মধ্যে? কল্যাণী কি সারাজীবন ধরে এই স্বামীর এই ঘর-সংসারের স্বপ্ন দেখেছিল? এই কামনা করেছিল? এখনো যদি ওকে সুদীর্ঘ দিন বাঁচতে হয়, ওই অনুদার লোকটার কাছেই থাকতে হবে।

কথাটা হৃদয়ঙ্গম করার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে আতঙ্কে বিতৃষ্ণায় কল্যাণী যেন শিউরে উঠল। আবার বন ছুঁয়ে আসা এক ঝলক হাওয়ার ঝাপটায় ওর শরীরটা শীতে কন কন করে উঠল।

এতক্ষণে যেন সম্বিত ফিরল কল্যাণীর।

এতক্ষণ ওর কোন অনুভব-শক্তি, কোন অনুভূতিই ছিল না। স্মৃতির অতীত জীবনের গভীর সমুদ্রে তলিয়ে গিয়ে বাহ্যশূন্য হয়ে বসেছিল। এখন মনে হল, বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। মনে হল, গরম কাপড়ের তোরঙ্গটা আজ রাত্রে খুলতেই হবে। ক'দিন ধরেই উলের সোয়েটার কোট গরম শাল বার করে রাখতে বলেছে ভবেন। কল্যাণী যদিও গরম জামা গায়ে দেয় না তবু ওর ছোট্ট লেডীজ শালখানাও বার করতে হবে। কাল খুব ভোরে ভবেন তার বন্ধুবান্ধব, ডাক্তার বাবু পোস্টমাস্টারবাবু অ্যাসিস্ট্যাণ্ট স্টেশন মাস্টারমশাই, কলকাতা থেকে আসা গাইয়ে ভদ্রলোকদের নিয়ে কোথায় কোন পাহাড়ে ঝর্ণার ধারে পিকনিক করতে যাবে। শুধু পুরুষরা নয়। মেয়েরাও যাবে। মিঠুর মা মাসী। ডাক্তারবাবুর স্ত্রী শালী। ভবেনের বন্ধুদের বৌ, বোনেরা সকলে যাবে। গান বাজনা রান্না বান্না হৈ হল্লা খাওয়া দাওয়া করে মনের আনন্দে ওদের সারাদিন কাটবে। ফিরবে সেই সন্ধ্যায়। যাবে না শুধু কল্যাণী। তার এ আনন্দে যোগ

দেবার কোন অধিকার নেই। সে এক নরকের পাপী। স্বর্গের আনন্দ সভা তার জন্যে নয়। উঠি উঠি করেও উঠতে ইচ্ছে হল না। শূন্য অন্ধকার ঘরে ঢুকতে ইচ্ছে হল না।

দূরে পাহাড়ের ও পাশ থেকে আকাশে চাঁদ উঠেছে। জ্যোৎস্নার আলোয় গাছগুলোকে জমে যাওয়া পাহাড়ের অংশবিশেষের মত দেখাচ্ছে। কল্যাণীর মনে হল, একদিন বোধ হয় কল্যাণীও ওই গাছগুলোর মত অনড় অচল হয়ে ভবেনের ঘরের খাট-আলমারির মত একটা আসবাবপত্রের সামিল হয়ে দাঁড়াবে। ওর চলৎশক্তি, কথা বলার ক্ষমতা হাসবার কাঁদবার বোধটুকুও আস্তে আস্তে নিঃশেষ হয়ে যাবে। পাথর হয়ে যাবে ও।

কল্যাণীর ইচ্ছে হল ও চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। ঘরে ঢুকে সব কিছু ভেঙে চুরে চুরমার করে দিয়ে দেশলাই কাঠি জ্বেলে সব পুড়িয়ে ছাই করে দেয়।

কিন্তু তবু ও উঠল না।

এক যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি গভীর বিষণ্ণতা ওকে ওই শীতার্ত অবস্থাতেই বারান্দার ওপর পাথরের প্রতিমার মতই বসিয়ে রাখল।

'মাইজী।'

কল্যাণী চমকে উঠল। 'কে? বুধন?'

গাছের আড়াল থেকে বুধন এগিয়ে এল। কল্যাণীকে বাইরে বসে থাকতে দেখে বিস্মিত ভাবে ওর নিজস্ব ভাঙা বাংলা-হিন্দী মেশানো ভাষায় বলতে লাগল, মাইজী কেন এত রাত অবধি বাইরে বসে আছে। এখন সময় ভাল নয়, হিম পড়তে শুরু হয়েছে। ঘরে ঘরে জ্বর-জাড়ি হচ্ছে। বোখার নিমোনিয়া সর্দি-কাশী। পাহাড়ী ঠাণ্ডা একবার লেগে গেলে বহুৎ মুশকিল। হরকিষণ বাবুর লেড়কীটা নিমোনিয়ায় মারা গেছে। মাইজী ঘরে গিয়ে দরজা-জানলা বন্ধ করে বসুন।

কল্যাণী হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। সত্যি তাঁর সমস্ত শরীর হিমে ভিজে গেছে। হাওয়া লেগে কাঁপুনি ধরে যাচ্ছে। শীত করছে।

বুধন কল্যাণীর কাছে এসে হাত বাড়াল—'এই টিকিটটা রাখুন

মাইজী। বড়ুয়া সাব বাবুজীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কাল ভোর-রাত্তিরের গাড়িতে তাঁর কলকাতায় যাবার কথা ছিল। কিন্তু ও'র লেড়কার সর্দি-কাশী-জ্বর হয়েছে বলে উনি যেতে পারবেন না। টিকিটটা রিফাণ্ড করতে হবে বলে দিয়েছেন।'

কল্যাণী টিকিটটা নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে বুধন। বাবু রাত্রে এলে আমি ও'কে দিয়ে দেব। এবার তুমি চলে যাও।'

বুধন ব্যস্তভাবে ঘাড় নাড়ল, 'নেহী নেহী মাইজী। বাবুজীর ফিরতে দেরী হবে। হামাকে থাকতে বলেছেন—'

'না-না বুধন, তোমাকে থাকতে হবে না। তুমি বাড়ী চলে যাও। আমার একা থাকা অভ্যাস হয়ে গেছে। রাত হয়েছে, বাবু আর একটু বাদেই ফিরবেন। আর এখানে তো ভয়ের কিছু নেই। তুমি বুড়ো মানুষ, কতক্ষণ বসে থাকবে?'

ওকে এক রকম জোর করে বাড়ি পাঠিয়ে কল্যাণী ঘরে ঢুকে দরজায় খিল তুলে দিয়ে আলো জ্বালল। সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট আসবাবপত্রে ঠাসা ঘরটা দেয়াল ক'টা সেই ম্লান আলোয় লোহার খাঁচার রূপ ধরে কল্যাণীর দিকে তাকিয়ে যেন দাঁত বার করে হেসে উঠল।

শীতার্ত শরীরটা আবার কেঁপে উঠল। হাত-পা বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। শাড়ির আঁচলটা ভিজে স্যাঁতসেঁতে।

বুড়ো বুধনের কথা মনে পড়ল। পাহাড়ী জায়গা। অঘ্রাণের ঠাণ্ডায় ওভাবে বাইরের খোলা বারান্দায় এত রাত অবধি বসে থাকা তার উচিত হয়নি। চারদিকে অসুখ-বিসুখ হচ্ছে। হরকিষণ বাবুর মেয়েটা নিমোনিয়ায় মারা গেছে। বড়ুয়া সাহেবের ছেলেটার ব্রঙ্কাইটিশ। তাছাড়াও ঘরে ঘরে জ্বর-জাড়ি লেগেই আছে। হয়তো কল্যাণীরও ঠাণ্ডা লেগেছে। কাল থেকে শুরু হবে জ্বর। বুকে সর্দি বসবে। জ্বর। ব্রঙ্কাইটিশ নিমোনিয়া প্লুরিসি। বিছানায় পড়ে পড়ে ছটফট করবে ও দিনের পর দিন। আহা বলবার, এক গ্লাস জল দেবার মানুষও ধারে কাছে থাকবেনা। ভবেন? নাঃ, তার চরিত্র স্বভাব স্বার্থ-পরতা ছ'বছরে আর এতটুকুও অস্পষ্ট নেই কল্যাণীর কাছে। তার সেবাযত্নে বিন্দুমাত্র ত্রুটি হলে সে চেঁচিয়ে ঝগড়া করে কল্যাণীকে অস্থির

করে তোলে। কাঁদিয়ে ছাড়ে। কিন্তু কল্যাণীর সুখ-সুবিধার দিকে ওর বিন্দুমাত্র দৃষ্টি দেবার সময় নেই।

তার প্রমাণ কি কল্যাণী পায়নি?

পেয়েছে বই কি। এই ছ'বছরে অনেক—অনেকবার পেয়েছে। বিয়ের প্রথম বছর কেটে যাবার পর থেকেই ভবেনের চরিত্রের পরিবর্তন হতে সুরু করেছিল। দ্বিতীয় বছর কেটে যাবার পর ও একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেছে। কল্যাণীকে ঘরের ভেতর বন্দিনী করে, তালাচাবি দিয়ে রেখে, ও মনের সুখে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়িয়েছে। যেখানে যখন গেছে, বন্ধু-বান্ধব জুটিয়ে তাদের সঙ্গে তাসের আড্ডা, গান বাজনার আসর, চড়ুই ভাতি পিকনিক এই সব নিয়ে মহানন্দে মেতে উঠেছে।

ওর এই আনন্দের জগৎ থেকে কল্যাণী চির নির্বাসিত!

সুস্থ অবস্থা দূরে থাক, অসুস্থ অবস্থায় কল্যাণী বিছানায় পড়ে থাকলে, তখনো কি ভবেন ওর জন্যে ঘরে বসে থেকেছে? ব্যস্ত হয়েছে? গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে? নিজে হাতে ওষুধ পথ্য খাইয়েছে?

না—না না। কখনো নয়। কোনদিনও নয়।

কল্যাণীর স্বাস্থ্য বরাবরই ভাল। সহজে ওর বড় একটা অসুখ বিসুখ হয় না। হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে বছর দুই আগে ওর খুব অসুখ করেছিল। সর্দি কাশী, গলায়, বুকে দারুণ ব্যাথা, সেই সঙ্গে বেশ জ্বর ওকে কয়েক দিনের জন্যে একেবারে কাবু করে ফেলেছিল।

যতক্ষণ সামর্থ ছিল, কল্যাণী, কাজকর্ম করে গেছে। রান্নাবান্না সব কিছুই। শরীর নাড়ানাড়ির ফলে অসুখটা বেড়ে খারাপের দিকে গিয়ে ওকে দু-তিন দিন পরে একেবারে শয্যাশায়ী করে ফেলেছিল।

ভবেন কিন্তু কল্যাণীর এই অসুখের জন্যে মোটেই চিন্তিত হয়নি। বাড়িতে ডাক্তারকে কলও দেয়নি। নিজে তাঁর চেম্বারে গিয়ে, অসুখের কথা বলে প্রেসক্রপশন করিয়ে ওষুধ নিয়ে এসেছে। দুদিনের জন্যে ছুটিও নেয়নি। বাইরে বেরুনোও বন্ধ করেনি। কোনমতে ডিউটি সেরে রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত তাসের আড্ডা জমাতে ওর বিবেকে বাধেনি।

এমনকি কল্যাণী ভবেনের জন্যে ভালমন্দ রান্না করতে পারছেনা বলে, নিজের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাও ও অন্য এক বন্ধুর বাড়িতে ব্যবস্থা করে

নিয়েছিল।

বাড়িতে যাহোক তাহোক কটাদিনের খাওয়ার অসুবিধাও ও সহ্য করতে পারেনি।

কল্যাণীর মনে পড়ে গেল, সন্ধ্যাবেলা বিছানায় শুয়ে জ্বরে, বুকের ব্যথায় ও ছটফট করছিল। বাইরে বেরুনোর জন্যে জামা কাপড় পরে প্রস্তুত ভবেন। ওষুধ আর জলের গ্লাশটা ওর হাতের কাছাকাছি টেবিলের ওপর রেখে বলেছিল; 'ওষুধ খেতে ভুলনা। টাইম মত ওষুধ না খেলে অসুখ সারবেনা। দেখছনা, আমার কত অসুবিধা হচ্ছে? তুমি বিছানায় পড়ে আছ বলে?'

'আমি কি ইচ্ছে করে অসুখ বাধিয়েছি?' ভবেনের কথা শুনে কল্যাণীর চোখে জল এসে গিয়েছিল। অভিমান রুদ্ধ গলায় অনুনয় করে বলেছিল 'আজ আমার শরীরটা খুব খারাপ লাগছে। আজ তাস খেলতে না হয় নাই বেরুলে। আমার কাছে থাকনা।'

খুব বিরক্ত হয়ে ভবেন জবাব দিয়েছিল, 'পুরুষ মানুষ বলে কথা। সারাটাদিন খাটা খাটুনি করি। সন্ধ্যায় একটু না বেরুলে চলে? শিউ-পূজনকে বলে যাচ্ছি কাজকর্ম সারা হলে ও তোমার ঘরের বারান্দায় বসে থাকবে। কিছু দরকার হলে ডেকো, হাতের কাছে এগিয়ে দেবে।'

ভবেন ওকে সেই অবস্থায় একা ফেলে রেখে তাস খেলতে চলে গিয়েছিল। একা রোগশয্যায় কল্যাণী সেদিন আকুল হয়ে কেঁদেছিল। বার বার মাসীর কথা, হেনা, মল্লিকা, জুঁই-এর কথা মনে পড়ছিল। যদি ওখানে এমন অসুখ হত। তাহলে ওকে এমন নির্জন নিঃসঙ্গ ভাবে একা পড়ে থাকতে হতনা। সবাই মিলে ওকে ঘিরে থাকত। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিত। ঘড়ি ধরে টাইম মত ওষুধ পথ্য খাওয়াত।

কোনদিনও কি ভবেন জবার স্মৃতিটাকে ওর মন থেকে মুছে ফেলতে পারবেনা?

না পারবেনা। এই ছ-ছটা বছরে তার সহস্র প্রমাণ ও পেয়ে গেছে।

কিন্তু কল্যাণীর এত ত্যাগ স্বীকার, এই সহনশীলতা নির্বাক আত্ম-বিলোপ, এসবের মর্যাদা আর সম্মানটুকুও কি ওকে কখনো দেবে না ভবেন?

না তাও দেবে না। বিয়ের পর থেকে ভবেনকে 'স্বামী দেবতা' জ্ঞানে তাকে আপ্রাণ সেবা যত্ন করেছে জবা। তার প্রতি একনিষ্ঠতা, তাকে ভালবাসা······

ভালবাসা! ভালবাসা! ভালবাসা!

কথাটা কল্যাণীর মনের মধ্যে যেন চমক দিয়ে উঠল। ভবেনের চরিত্র ও বিশ্লেষণ করছে, কিন্তু ওর নিজের মন কী বলে?

এই ছটা বছর বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্কহীন হয়েও অসূর্যম্পশ্যার মত অবরোধের ভেতর জীবন কাটিয়েও, ভবেনের প্রতি চরম আনুগত্য সত্ত্বেও কল্যাণী ওকে কি সত্যি সত্যি ভালবাসতে পেরেছে? যেমন আরো শত সহস্র বাঙ্গালী মেয়েরা তাদের স্বামীর সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী হয়ে আজীবন স্বামীর ঘর করে?

ভয়ানক ভাবে চমকে উঠে কল্যাণী তার হৃদয়ের মধ্যে মনের মধ্যে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল। না সে ভালবাসা তার নেই। সেই সর্বস্ব সমর্পণের মত নিঃসর্ত অকৃত্রিক ভালবাসা তার নেই। ভবেন, ভবেনই। আত্মকেন্দ্রিক রূপযৌবন মুগ্ধ অতি সাধারণ একটা পুরুষ মাত্র। যে জবার মনটাকে বুঝতে চায়নি। মনের খবর রাখেনি। শুধু ওর দেহটাকেই নিজের প্রয়োজন মত ব্যবহার করে এসেছে এতকাল।

জবার ওপর যে ভালবাসা যে মুগ্ধতা যে মোহ একদিন ছিল, জবা কল্যাণী হবার পর ছ'বছরে তার অবশিষ্ট কিছুই নেই। পাখি যখন আকাশে থাকে, তাকে ধরবার আকাঙ্ক্ষা তখনি দুর্দমনীয়। কিন্তু সে পাখিকে একবার খাঁচায় পুরতে পারলে তার দিকে ফিরে তাকানোর মত সময় অন্তত ভবেনের মত হৃদয়হীন আত্মসর্বস্ব মানুষের থাকে না।

ছ'বছরে এই জীবন-দর্শন ভাল ভাবেই হয়েছে কল্যাণীর।

এই চার দেয়ালের খাঁচার মধ্যেই ও ভবেনের সেবাদাসী মাত্র। একটা চাকরাণী মাত্র। বাইরের জগতে ও কেউ নয়। নয় ওর বন্ধু বান্ধব সমাজে। সে জগৎটা শুধু ওর নিজস্ব। সেখানে কল্যাণী অবাঞ্ছিত, পরিত্যক্ত।

নিঃসঙ্গতা— অসুখ— মৃত্যুভয়—পরস্পর-বিরোধী জটিল অসংলগ্ন

চিন্তাধারায় কল্যাণীর সমস্ত হৃদয় আলোড়িত হয়ে উঠল। আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবহীন অবস্থায় দূর-বিদেশে নিঃস্বের মত ওকে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভুগে ভুগে মরতে হবে।

কে জানে নির্বান্ধব নির্জন ঘরের মৃত্যু-যন্ত্রণায় একা একা ও ছটফট করবে। কোন ডাকাতের হাতে খুন হয়েও যেতেও তো পারে? সাপের কামড়ে, শাড়িতে আগুন লেগে অ্যাক্সিডেণ্টও তো হতে পারে? কে তখন ওকে দেখবে? চিৎকার করে গলা ফাটালেই বা কে আসবে সাহায্য করতে?

এই অশরীরী আতঙ্ক ভয় ভাবনার হাত এড়ানোর জন্যে অন্যমনস্ক হবার জন্যে কল্যাণী তাড়াতাড়ি তোরঙ্গটা খুলে ফেলল। ওপরের সুতীর শাড়িগুলো নামিয়ে একেবারে নীচের দিকে ন্যাপথলিন দিয়ে জড়িয়ে রাখা গরম চাদর আর সোয়েটারগুলো টেনে বার করতেই সাচ্চা জরীর কাজ করা কি যেন সব ঝক ঝক করে উঠল ওর চোখের সামনে।

মুগ্ধের মত আচ্ছন্নের মত আস্তে আস্তে বাক্সের তলা থেকে সেগুলোকে টেনে বার করল কল্যাণী। আবিষ্টের মত বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সেই মহার্ঘ পরিচ্ছদের দিকে।

চোলি ব্লাউজ ঘাঘরা ওড়না—সাচ্চা জরীর কাজ করা। নকল পাথর বসানো। অদ্ভুত সুন্দর! চোখ-ধাঁধানো নাচের পোষাক।

নরক! নরকের স্মৃতি! নরকের পাপ ওই পোষাকের প্রত্যেকটি সুতোয় জড়ানো। কোন এক মাইফেলে জবার নাচ দেখে মুগ্ধ হয়ে জবার একজন রসিক প্রেমিক, অনেক টাকা খরচ করে ওর গায়ের মাপে মাপে এই পোশাকটা করিয়ে দিয়েছিল। তার সামনে শুধু এই পোশাকটি পরেই নাচতে হত জবাকে।

নাচের তালে ঘাঘরা উড়ত। ওড়না উড়ত। সেই সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত পাখার পাখির মত জবাও উড়ত। জরী জড়ানো আর বেলকুঁড়ি জড়ানো সাপের মত লম্বা বেণীটাও ওর বুকের ওপর পিঠের ওপর উড়ত—দুলত—

নাচ গান বাজনা। বেলফুল জুঁইফুল। আলো আর লোক। আলো হাসি গান। ভবেনের চেয়েও সুদর্শন কুদর্শন মস্ত নামী মানী মানুষজন। গাড়ি-জুড়ি হাঁকিয়ে যাদের আসা যাওয়া।

সেই নরকের জীবনটা সমুদ্রের মত উদ্দাম উত্তরঙ্গ। কোনমতে রয়ে রয়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরা নয়। প্রতি মুহূর্তে দাও দাও আরো দাও। বিনিময়ে নাও নাও আরো নাও। সময় চলে যাচ্ছে। তুমি ফুরিয়ে যাচ্ছ—আমিও ফুরিয়ে যাচ্ছি – মদির মদালস রাত্রিকে উপভোগ কর,—পূর্ণপাত্র জীবনসুরা উপচে পড়ছে—তোমার রক্তিম ওষ্ঠাধর ছোঁয়াও – নিঃশেষে চুমুক দাও। তাকে শূন্য করে দিয়ে তুমি নিজে পূর্ণ হও। ধন্য হও।

কল্যাণী সহসা ঝড়ের দোলায় আন্দোলিত লতার মত চঞ্চল হয়ে উঠল। নাচের পোশাকটা, আরো খানকতক ভাল ভাল শাড়ি ব্লাউজ ইত্যাদি বার করে রেখে তোরঙ্গটা বন্ধ করতে না করতেই বাইরে ভবেনের জুতোর শব্দে সচকিত হয়ে দরজা খুলে দিল।

ভবেন ঘরে ঢুকল। জুতো-জামা ছাড়তে ছাড়তে পরিতৃপ্তির উদ্গার তুলতে তুলতে খুশী মুখে বলল, 'ওঃ, কী খাওয়াটাই না খাইয়েছে! কত রকম রান্না করেছিল। নড়তে পারছি না।'

বিতৃষ্ণা ভরা চোখে ভবেনের দিকে ভাল করে তাকাল কল্যাণী। কী নগ্ন লোলুপতাই না ওর চোখে-মুখে! কী সাংঘাতিক খেতে পারে মানুষটা, আশ্চর্য! খেয়ে খেয়ে ছ' বছরে কী মোটা—কী কুৎসিত দেখতেই না হয়েছে ওকে!

বারান্দায় রাখা বালতির জলে হাত-মুখ ধুয়ে আবার ঘরে ঢুকল ভবেন। গোটাকতক ঢেঁকুর তুলে বলল, 'কাল রাত থাকতেই আমাকে চলে যেতে হবে। ওদের ডেকে তোলা, জিনিসপত্র গাড়িতে তোলা, সব হাঙ্গামা আমাকেই করতে হবে। কাল সমস্ত দিন থাকব না। পরশু তুমি বেশী করে মাংসের চপ আর বিরিয়ানী করে দিও তো। ওদের বাড়ী প্রায়ই খেয়ে আসি। বাড়িতে তো নেমন্তন্ন করতে পারব না, তাই ভাবছি বিরিয়ানী আর মাংসের চপ দিয়ে আসব। শুধু এক তরফা খেয়ে এলেই তো হয় না। চক্ষুলজ্জা বলে তো একটা কথা আছে। ওদেরও খাওয়ানো দরকার। কি বল?'

'তা তো বটেই।' একটা ছোট্ট সুটকেস খালি করে তাতে সদ্য তোরঙ্গ থেকে বার করা শাড়ি ব্লাউজ এটা ওটা ভরতে ভরতে কল্যাণী জবাব দিল।

ভবেন খুশী হল ওর কথায়। 'আমি ওদের কাছে তোমার কথা খুব বলেছি। বলেছি, আমার বৌ খুব চমৎকার রান্না করতে পারে। আমার গরম জামা বার করেছ?'

'হঁ্যা, এই তো। কাল রোদে দেব।'

'বেশ বেশ। আমি তো থাকব না। তোমার আর কাজ কি বল? পিকনিকে অবশ্য সবাই ফ্যামিলি নিয়ে যাচ্ছে, তোমাকে নিয়ে যাবার কথাও বলেছিল। কিন্তু অনেক লোকজন, কলকাতা থেকে ক'জন গাইয়ে এসেছে, বুঝতেই তো পারছ। যদি কেউ তোমাকে চিনতে পারে, তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমি তাই এড়িয়ে গেলাম, তোমার শরীর খারাপ বলে দিলাম। তুমি রাগ করনি তো?'

'রাগ করব কেন? কল্যাণী সুটকেসটা বন্ধ করল। 'আমি তো কোথাও যাই না। ভাল লাগে না।'

'তুমি বুদ্ধিমতী। নিজের ভাল বুঝতে শিখেছ।' আরো খুশী হয়ে ভবেন বিছানায় উঠে শোবার বন্দোবস্ত করতে করতে বলল, 'যাই বল, আমি বলে তাই সব জেনে-শুনে তোমাকে বিয়ে করেছি। ভগবান রক্ষে করেছেন, তোমার কোন ছেলে-পুলে হয়নি। হলে, ভবিষ্যতে তোমার আসল পরিচয় জানতে পারলে কী ভীষণ কেলেঙ্কারি হত বল দেখি? যাই হোকগে, ভদ্রসমাজে ঢুকতে পেরেছ, স্বামী-সংসার পেয়েছ এই ঢের। মেয়েমানুষের এই তো স্বর্গ। এটাকে বজায় রাখতে পারলেই হল। বাইরে পাঁচজনের সঙ্গে অত মেলামেশার দরকারটাই বা কিসের? মাসী কি বলে দিয়েছিল আসবার সময়, মনে নেই?'

'আছে বই কি। সেই জন্যেই তো—' বুধনের দেওয়া ফার্স্ট ক্লাসের টিকিটখানা হাতের মুঠোয় অনুভব করতে করতে কল্যাণী আবার সুটকেসটা খুলল। অতি সাবধানে এক কোণে রেখে দিল সেটাকে।

'আর একটা কথা বলে রাখি।' ভবেন গায়ের ওপর কম্বলটা টেনে শুয়ে পড়ে তন্দ্রাজড়িত গলায় বলল, 'কাল ফিরতে দেরী হলে ভেবো না। রাত্রে এসে বেশী খাব না। ধোকার ডালনা আর ফুলকপি কড়াইশুটির চপ করে রেখো। ওই সঙ্গে বেগুনভাজা। মাছ যদি পাওয়া যায়, খুব ঝাল দিয়ে চচ্চড়ি করে রেখো। আমি এলে তারপর গরম লুচি ভেজে

দিও। সমস্ত দিনই তো খাওয়া-দাওয়া চলবে, মাংসও হবে, তাই মাছ না হলেও ক্ষতি নেই। বুঝলে?'

'আচ্ছা।' কল্যাণীকে হঠাৎ এটা ওটা সেটা নানা কাজে খুব ব্যস্ত মনে হল।

'তোমার খাওয়া হয়েছে? এত রাত্রে আবার এত কী কাজ শুরু করলে এখন? আলোটা নিভিয়ে দাও। বড্ড ঘুম পাচ্ছে। খাওয়াটাও বেশী হয়ে গেছে। কাল কলকাতার ট্রেন পাস্ করার অনেক আগেই আমাকে পিকনিকের ব্যবস্থার জন্যে ক্লাবে ছুটতে হবে। দেবেন বাবুও থাকবেন না। তবে অসুবিধা হবে না। ম্যানেজ করে এসেছি। ক'মিনিটই বা গাড়ি থামবে? ভোর চারটেয় অ্যালার্ম দিয়ে রাখ তো ঘড়িটায়।'

কল্যাণীর জবাবের অপেক্ষায় না থেকে ভবেন পাশবালিশ জড়িয়ে চোখ বুজল। এলোমেলো আরো দুটো একটা কথা বলার পরই ও ঘুমিয়ে পড়ল।

কল্যাণী ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে আলো নিভিয়ে দিল। বাইরের বারান্দার দিককার খোলা জানলা দিয়ে হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। সেটাকে বন্ধ করে দেবার জন্যে জানলাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। লোহার গরাদে হাত রেখে, শেষবারের মতই বাইরের দিকে, স্টেশনের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করল।

সেই একই দৃশ্য। দুটো সমান্তরাল লাইন। জীবনেও যে দুটো সরলরেখা এক হয়ে মিশে যাবে না। কাঁটালতার ঝোপ। লম্বা লম্বা প্রহরীর মত গাছ গাছালি। দূরে পাহাড়ের চূড়া। তার ওপর জ্যোৎস্নার ঢল নেমেছে। অতি সুন্দর স্বর্গীয় দৃশ্যের অবতারণা করে রেখেছে।

আর সেই সঙ্গে চারিদিকে সীমাহীন নিঃসীম শূন্যতা।

এই শূন্যতা এই নির্জনতা নিঃসঙ্গতা ছাড়া এই অলৌকিক অপার্থিব স্বর্গরাজ্যে কল্যাণীর জন্যে অন্য কিছুই নেই। ছ'বছর ধরে এই স্বর্গরাজ্যে নির্বাসিত হয়ে আছে কল্যাণী। এখানে পাপ নেই। অধর্ম নেই। আছে শুধু পুণ্য আর পুণ্য। সতীলক্ষ্মীর পুণ্য!

জানলা বন্ধ করে অন্ধকারের মধ্যেই নিরাবরণ হল কল্যাণী। চুমকী আর মুক্তোবসানো ছোট্ট চোলিটা পরল। কী আশ্চর্য! ছ'বছরে ও তো এতটুকুও মোটা হয়নি। বুকের গড়ন, শরীরের গড়ন ঠিক একরকমই রয়ে গেছে।

তেমনি মসৃণ চামড়া। উন্নত উদ্ধত বুক—নিটোল জঙ্ঘা—সরু কোমর……

একটা ছেলেপুলে হলে হয়তো এমন থাকত না।

কে জানে সুখে না দুঃখে কল্যাণী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

তারপরই চোলিটা খুলে সুটকেসটার ভেতরে রেখে অতি সন্তর্পণে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

আজ সমস্ত রাত ওর ঘুম হবে না। অ্যালার্ম বাজবে চারটেয়। ভবেন উঠবে। হাত-মুখ ধুয়ে জামাকাপড় পরে বেরিয়ে যাবে। কল্যাণী দরজা বন্ধ করে ভোর পাঁচটার গাড়িটার জন্যে তৈরী হবে।

এক ঘণ্টা সময়টা কি কম?

ছ' ছ'টা বছর ধরে যা পারেনি, মাত্র এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে কল্যাণী তাই পারবে। স্বর্গে ওঠবার জন্যে অনেক সময় লাগে। নরকের পথ বড় পেছল। নামতে দেরী হয় না।

অঘ্রাণের কোন এক কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকার রাত্রে মালতী-নিবাসের সব ক'টি মানুষ কলিং-বেলের কান-ফাটা আওয়াজে সচকিত হয়ে ঘুম ভেঙে জেগে উঠল।

এমন অদ্ভুত ঘটনা এখানে, এ বাড়ীতে এই প্রথম ঘটল।

মালতী-নিবাসের মানুষগুলোর কোথাও কোন আত্মীয়-স্বজন নেই। যারা এই শীতের ভোরবেলায় এসে কলিং-বেল টিপে সবাইকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলবে।

বন্ধ দরজা খুলে আলুথালু বেশে উস্কো-খুস্কো চুলে মালতী সেনই প্রথমে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বারান্দার আলো জ্বাললেন।

বয়সের সঙ্গে রাতের ঘুম তাঁর অনেকদিন থেকেই কমে গেছে। নানা-রকম অশান্তি ভাবনা চিন্তাও ঢুকেছে। ব্যবসা ভাল চলছে না। অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছেন না। দেখতে দেখতে ক'টা বছরের মধ্যেই ভদ্রঘরের ইস্কুল-কলেজের মেয়েরাও এই ব্যবসায় লাইন দিতে নেমেছে। শুধু তাই নয়। তারা দারুণ চালাক হয়ে গেছে। একাই একশ। তাদের আর 'মাসী'দের কোন দরকারই হয় না। খদ্দের ধরা দরদস্তুর করা সব বিষয়ে ওরা একেবারে ওস্তাদ।

'মাসী!' দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে জবা মালতী সেনের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

'জবা! তুই!' মালতী সেন স্তম্ভিত বিস্ময়ে জবার মুখের দিকে তাকালেন। বহুদিন পর বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে যাওয়া মেয়েটা মায়ের কাছে ফিরে এলে তাঁর যে আনন্দ হয়, সেই অকৃত্রিম আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে লাগলেন, 'ধন্যি মেয়ে তুই মা জবা! একেবারে আমাদের ভুলে গেছিস? তেরো বছরেরটি তোকে আমার হাতে তুলে দিয়ে তোর মা নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুজেছিল। সেই থেকে বুকে পিঠে করে পেটের মেয়ের চেয়েও বেশী ভালবেসে তোকে মানুষ করেছি। বিয়ে দিয়েছি। আর তুই সব ভুলে গিয়ে—'

মালতী সেনের চোখে জল। অভিমানে কণ্ঠরুদ্ধ।

জবার চোখেও জল। 'মাসী, তোমার জন্যে ভীষণ মন খারাপ হয়েছিল, মন কেমন করছিল। তাই তো চলে এলাম।'

'ভবেন কোথায়?' তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে মাসী এদিক-ওদিক তাকান। কিন্তু ছোট্ট একটা সুটকেস ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলেন না।

'আমি একাই তোমার কাছে চলে এসেছি মাসী। আর কেউ আমার সঙ্গে আসেনি।'

'সে কী রে! জবার নির্লিপ্ত কঠিন কণ্ঠস্বরে মালতী সেন আরো একবার চমকে উঠলেন।

জবা ততক্ষণে আত্মস্থ হয়েছে। চোখ মুছে আত্মসংবরণ করে মাসীর হাত ধরে ঘরে বিছানায় বসেছে। দরজার কাছে আরো ছ'টা মেয়ের উল্লসিত আনন্দিত বিস্মিত চোখের দৃষ্টিও মিলেছে। মাসীর মত তাদের সকলের চোখেই সেই এক প্রশ্ন—এক জিজ্ঞাসা। জবা একলা এসেছে কেন? জবার ইহকাল পরকালের দেহ মন আত্মার মালিক তার স্বামী কেন তার সঙ্গে আসেনি?

'আমি এখানে এসেছি ভবেন সেকথা জানে না মাসী। আমি পালিয়ে এসেছি। ওখানে আর কোনদিনও ফিরে যাব না।'

'তুই পালিয়ে এসেছিস! ওখানে আর ফিরে যাবি না! বলিস কি? তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে?' মালতী সেন যেন এতবড় অসম্ভব

অবিশ্বাস্য কথা কখনো শোনেন নি, এমন ভাবে জবার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন।

'আমার মাথা ছ'বছর আগে খারাপ হয়েছিল মাসী, এখন ভাল হয়ে গেছে। তোরা কি দেখছিস হাঁ করে? এই জুঁই, গরম গরম চা খাওয়া তো দু কাপ। এই মল্লি, তুই কিন্তু একটু মোটা হয়েছিস। চল চল ও-ঘরে। টগর, তুই ভাই সুটকেসটা নিয়ে আয়। আমি আর পারছি না বাপু হ্যাঁ। ঘুম যা পেয়েছে না!' দলবল সুদ্ধ মেয়েরা চলে যেতেই মালতী সেন আবার বিছানায় শুয়ে পড়লেন। জবা আবার ফিরে আসাতে আনন্দে তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল। গলা ছেড়ে দিয়ে এবার তিনি তাঁর সেই পুরনো অভিজ্ঞতা-লব্ধ উপদেশাবলী বার বার চেঁচিয়ে (যাতে ওদের সকলের কানে পেঁছিয় এমনভাবে) শুনিয়ে দিতে লাগলেন। বলিনি? হাজার বার, লক্ষ কোটি বার বলিনি, ঘর-সংসার তোদের জন্যে নয়? দিলে তো তাড়িয়ে? না কি নিজেই ঝগড়া করে চলে এলি, ওই একই কথা। সেই তো আবার আমার কাছেই ফিরে আসতে হল! এত পুরুষ ঘাঁটলি, এত পুরুষের সঙ্গে মিশলি, তবু ওদের স্বভাব-চরিত্র চিনতে পারলি না? বোকার বেহদ্দ! ওদের সঙ্গে ফেল কড়ি মাখ তেল, এমন ভাব নিয়ে মেলামেশা করবি, তা না পেরেম ভালবাসা করার শখ! বৌ হয়ে তার ঘর-কন্না করার শখ! হল তো? ফলল তো আমার কথা? তবু ভাল, সময় থাকতে থাকতে ভালয় ভালয় ফিরে এসেছিল। ঝাড়া-হাতে পায়। গুটি দুতিন বাচ্চা নিয়ে এলেই তো সব্বোনাশ হত। ভাগাড়ে পচতে হত। মতিচ্ছন্ন হলে ভালকথাও বিষ লাগে...ইত্যাদি অনেক কথাই বলতে লাগলেন মালতী সেন। কথা বলা ছাড়া অত রাত্রে তাঁর অন্য কিছু করার উপায় ছিল না। তারপর একসময় কথা বলা বন্ধ করে মনের আনন্দে বড় বড় কথা মুখস্থ করতে লাগলেন। সকাল হলেই চাঁদা-দেনেওলা হাই ফ্যামিলিগুলোতে একবার ছুটতে হবে। অত পয়সা খরচ করে বিয়ে দিলেন মেয়েটার, কিন্তু দেখ কপালের দশা। ছ'টি বছর কাটতে না কাটতেই মেয়েটাকে ফের তাড়িয়ে দিল। আবার আমার ঘাড়ে এসে পড়ল। কী যে করি! দূর করে তো আর সোমত্ত মেয়েটাকে তাড়িয়ে দিতে পারি না।...

তারপরই মনে পড়ল 'ইন্দ্রাণী' হোটেলের মালিকের কথা।

দারুণ ফিগারওলা একটা রিসেপসনিস্ট মেয়ে চায়। ছ'বছরে মেয়েটার চেহারা যেন আরো সুন্দর হয়েছে...হে মা কালী, ব্যবসা বড় মন্দা যাচ্ছে মাগো—তোমার কৃপায় মেয়েটা ফিরে এসেছে। এবার তুমি দয়া করে মুখ তুলে তাকাও মা!

মাসী খুশী হলেও টগর হেনা মল্লিকারা কিন্তু খুশী হল না।

জবা ট্রেনের শাড়ী জামা ছাড়ল। ভাল করে চা খেল। স্নান করল। ওদের সঙ্গে পুরণো এটা ওটা সেটা নানা গল্প করল। তারপর যাহোক কিছু খেয়ে দেয়ে নিজের ঘরে খিল দিয়ে দিব্যি শুয়ে পড়ল।

পরদিন সকাল থেকেই ওরা ছটফট করতে লাগল। ভয়ে সংশয়ে। কেন এমন হল? কেন চলে এল জবা? সব জেনে শুনেই তো ভবেন ওকে বিয়ে করে নিয়ে গিয়েছিল, তবে?

কিন্তু যাই বল, এই ক' বছরে জবা আরো সুন্দর হয়েছে। গায়ের রং যেন ফেটে পড়ছে। মনের দুঃখে থাকলে কি তার চেহারায় এত জেল্লা খোলে? এত সুন্দর হয়ে থাকতে পারে সে? অমন সুন্দর চেহারা নিয়ে মাসীর এই নরকে ফিরে আসার মানেটা কি আর ও জানে না?

সমস্ত দিনটা কাটল। মালতী-নিবাসের পুরনো নিয়মে। দুপুরবেলা খেয়ে দেয়ে জবা নিজের ঘরে খিল তুলে দিয়েছিল বলে কোন কথা বলা-কওয়া হল না। সন্ধ্যাবেলা ওরা নিজেরাই ব্যস্ত রইল নিজেদের বাবুদের মনোরঞ্জনের কাজে-কর্মে।

তারপর রাত্রে জবা শোবার ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ওরা সকলে ওকে ঘিরে ধরল। গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে। আর চুপচাপ থাকা সম্ভব হচ্ছে না।

ওদের গুরুগম্ভীর মুখ দেখে জবা খিল খিল করে হেসে উঠল। 'কী রে মেয়েগুলো? কী হয়েছে তোদের? এটা কি শোকসভা না কি? কেউ কি মরেছে?'

'তুমি হাসছ জবাদি?' জুঁই অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। 'আমরা তো ভয়ে তোমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতেই পারছি না।'

'তোমার কষ্ট হচ্ছে না? পারুল বোকার মত প্রশ্ন করে।

'হাসব নাই বা কেন? আর কষ্টই বা হবে কেন?' জবা হাসি থামিয়ে ভুরু কুঁচকে ওদের দিকে তাকায়।

'এখানে আবার ফিরে এলে কেন?' ভবেনবাবুর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে?' হেনা জেরা করল।

'দূর! ঝগড়া হবে কেন?' জবা অলস ভাবে বিছানার ওপর এলিয়ে পড়ে।

'ভবেনবাবু যদি কিছু বলেই থাকেন, তাঁর হাতে-পায়ে ধরে তোমার ওখানে পড়ে থাকাই উচিৎ ছিল।' কথাটা বলেই মল্লিকা জবার পাশে বসে পড়ল।

'ওখানে থাকবার জন্যে আমাকে ওর হাতে-পায়ে ধরতে হবে কেন?' বিস্ময়ের কারুকার্য জবার চোখে-মুখে. 'বরং ও-ই তো আমাকে হাতে-পায়ে ধরে সেধে ওখানে থাকবার জন্যে নিয়ে গিয়েছিল। মাসী ভেবেছে ভবেন বুঝি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাই অত চেঁচাচ্ছিল। ও আমাকে তাড়িয়ে দেবে কেন? আমি ওকে ত্যাগ করে চলে এসেছি।'

'তু-তু-তুমি তোমার স্বামীকে ত্যাগ করে চলে এসেছ! কী বলছ তুমি! চামেলী টগর পারুল যূথি হেনা মল্লিকা ছ'টি মেয়ে অসহ্য বিস্ময়ে নিশ্বাস ফেলতে ভুলে গিয়ে বুঝি দম বন্ধ করে জবার দিকে তাকিয়ে থাকে। আলো-নেভানো ঘরের অন্ধকারে ওদের চোখগুলো উদগ্র কৌতূহল নিয়ে অজানা আশঙ্কায় দপ্ দপ্ করে জ্বলতে থাকে।

'হ্যাঁ আমি। আমিই ওকে ত্যাগ করে চলে এসেছি।' জবা বালিশে মুখ গুজে কেমন এক অদ্ভুত অলস রহস্যময় গলায় আস্তে আস্তে থেমে থেমে বলতে থাকে। আমি যেন মরে যাচ্ছিলাম। আমি আর ওখানে থাকতে পারছিলাম না। আমি যেন দিন দিন ঠাণ্ডা হয়ে বরফের মত জমে যাচ্ছিলাম। আমার দিনগুলো আমার রাতগুলো ক্রমশঃ অসহ্য হয়ে উঠছিল। বলতে পারিস ভাই টগর হেনা চামেলী, মাত্র একটা অতি সাধারণ পুরুষমানুষকে নিয়ে ভদ্দোরলোকের বৌরা কেমন করে সারা জীবন কাটায়? সকাল থেকে সন্ধ্যে, সন্ধ্যে থেকে রাত, তারপর দিন...তারপর দিন...দিনের পর দিন ... দিনের পর দিন...মাত্র একটা পুরুষকে নিয়ে—বলতে পারিস?

—শেষ—